জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা

মহুয়া রউফ

২৩ জুন ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি এবং চর্চা

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মহুয়া রউফ, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নে নিবিড় সহযোগিতা প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। জনপ্রশাসনে কর্তব্যরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণাকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশ:২৩ জুন ২০১৯

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার, রাজনীতি ও বেসরকারি খাতসহ সমাজের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহুমুখী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সুপারিশ সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক সামর্থ্য অর্জনে অবদান রাখছে।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা সরকার তথা সার্বিকভাবে দেশের শাসন কাঠামোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায়পরায়ণভিত্তিক একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় ২০১২ সালে সরকার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করে। এই কৌশলে দশটি রাষ্ট্রীয় ও ছয়টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যার মধ্যে জনপ্রশাসন একটি উল্লেখযোগ্য খাত।মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' প্রণীত হওয়ার পর ছয়বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হলেও জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় এটি কিভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার কোনো সার্বিক পর্যালোচনা এখনো হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি ও চর্চা' শীর্ষক বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি কাঠামো, সংশ্লিষ্ট আইনের চর্চা ও প্রয়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা, এবংগবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। বর্তমান গবেষণায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিতআইনি ও নীতি কাঠামো এবং এর চর্চা অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়,শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক (যেমন প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতন কাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন) হলেও কোনো কোনো কৌশলের চর্চা এখনো শুরু হয় নি (যেমন, বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন, এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন)। রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি) এবং প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রশাসনের রাজনীতিকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটার ফলে পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যদাতা ও অন্যান্য অংশীজনের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মহুয়া রউফ। গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নসহ গবেষণাটির বিভিন্ন পর্যায়ে নিবিড় পরামর্শ প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান। এছাড়া টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণাটির তত্ত্বাবধান করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য সহকর্মীরা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন - তাদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকেরা জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

অধ্যায় এক: ভূমিকা ৬
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৭
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৮
১.৪ গবেষণার আওতা ৮
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৮
১.৬ গবেষণার সময় ৮
১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো ১০
অধ্যায় দুই: জনপ্রশাসন: বিবর্তন, ভূমিকা ও আইনি কাঠামো ১০
২.১ জনপ্রশাসন:বিবর্তন ১২
২.২ জনপ্রশাসনের ভূমিকা ১২
২.৩ জনপ্রশাসনের আইনি কাঠামো ১২
অধ্যায় তিন: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত কৌশলগুলি বাস্তবায়ন: সরকারের বিদ্যমান আইনের চর্চা ১৩
৩.১ প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী জমাদান ১৪
৩.২ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন ১৪
৩.৩ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন ১৫
৩.৪ আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা ১৬
৩.৫ প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা ১৯
৩.৬ পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন ২৩
৩.৭ ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন ২৪
৩.৮ কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ২৪
৩.৯ জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ২৬
৩.১০ সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার ২৮
৩.১১ যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ২৯
অধ্যায় চার: জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় চ্যালেঞ্জ ৩১
অধ্যায় পাঁচ: উপসংহার এবং সুপারিশ ৪০
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৪১

সারণির তালিকা

সারণি ১:গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো ০৮
সারণি ২: সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন এবং কমিটিসমূহ ১০
সারণি ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে সরকারের আইনি প্রস্তুতি ১৩
সারণি ৪: জিআরএস পদ্ধতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃকনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ................................ ১৬
সারণি ৫: অনিয়ম, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে দুদক কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত সরকারি কর্মকর্তা ১৬
সারণি ৬: বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা ২০
সারণি ৭: উর্ধ্বতন পদসমূহে (উপসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে অধিক নিয়োগ.. ২০
সারণি ৮: গ্রেড ৯ থেকে গ্রেড ৬ পর্যন্ত পদসমূহে নিয়মিত পদের বিপরীতে সীমিত নিয়োগ ২০
সারণি ৯: চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা ২১
সারণি ১০: লিঙ্গভেদে জনপ্রশাসনে কর্মকর্তা বিভাজন ২৩
সারণি ১১: সরকারি তথ্যমতে ওএসডি কর্মকর্তার সংখ্যা (২৪ জুলাই ২০১৮).. ২৭
সারণি ১২:বিসিএস এর বিজ্ঞপ্তি হতে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত ব্যয়িত সময় ৩৪
সারণি ১৩:জাতীয় বাজেট থেকে বেতন-ভাতায় বরাদ্দের (কোটি টাকা) ৩৮

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: জনপ্রশাসনে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নারী-পুরুষ ভেদে বিভাজন ২২

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যেকোন সরকারের একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন। এ কাঠামো রচিত হয় সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। জনপ্রশাসনের প্রধান কাজ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিশেষ করে, জনপ্রশাসন সরকারের সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, এবং নিয়ন্ত্রণ করে। পল এপলবাই ১৯৪৭ সালে জনপ্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, "জনপ্রশাসন হচ্ছে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সরকারি নেতৃত্ব যা সরাসরি সরকারের সকল নির্বাহী কর্মের জন্য দায়ী।" তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনকে এমন নেতৃত্ব ও নির্বাহী কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হয় যা নাগরিকেরসম্মান, গুরুত্ব এবং ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদান রাখে।[১]জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা সরকার, রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সমাজের সকল স্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সরকারের নির্বাহী বিভাগ গঠিত হয়।[২] নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয় জনপ্রশাসন। একটি দক্ষ ও উন্নয়নশীল প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠে তার কাঠামো, কার্যক্রম, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মপরিবেশে। জনপ্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ নীতি প্রণয়ন কাঠামোর কাছাকাছি থাকেন এবং নীতি বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো একদিনে গড়ে ওঠেনি। উপনিবেশ-উত্তর বহু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান কাঠামো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৩] ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ছিল রাজস্বমুখী। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। ১৭৯৩ হতে রাজস্ব আদায়ই ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান কাজ। লর্ড কর্নওয়ালিস যেসব আইনকানুন ও প্রশাসনিক রীতিনীতি প্রণয়ন করেছিলেন তার অধিকাংশই রাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্টদের বলা হতো কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভেন্ট। এ সার্ভিসের সদস্যরা ভারতে চাকরির জন্য ভারত সচিবের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন বিধায় এ চাকরির নাম হয়েছিল কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিস (সিসিএস)। বেসামরিক চাকরি থেকে স্থানীয় লোকদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে বেসামরিক প্রশাসন শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এভাবেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের জন্য পেশাদার বেসামরিক সার্ভিসের গোড়াপত্তন হয়।[৪]১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার একচেটিয়া অধিকার আংশিকভাবে এবং ১৮৩৩ সালে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। ১৮৩৩ সালের আইনবলে কোম্পানি রাজা বা রানীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় একটি সংস্থায় পর্যবসিত হয়। এ আইনে নয়া উদারপন্থী পার্লামেন্ট কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসে (সিসিএস) চাকরি ও সার্ভিস প্রদানের আদলে দেশীয়দের অর্থাৎ ভারতীয়দের ক্ষমতার ভাগ দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং ১৮৩৩ সালের আইনবলে সিসিএস চাকরিতে দেশীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৮৬১ সালে সিএসএস-এর নতুন নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা একই সঙ্গে ভারত ও ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়। ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা উচ্চতর পদমর্যাদার সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ পায়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া নিপীড়নমূলক জনপ্রশাসনই বহাল থাকে। দেশভাগের পর সিভিল সার্ভিসের পাকিস্তান অংশকে করা হয় সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি)। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের 'প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি'। বাংলাদেশের বর্তমান জনপ্রশাসন ব্রিটিশ শাসকের তৈরি জনপ্রশাসনের উত্তরাধিকার বহন করছে।[৫]

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৩-১৩৬ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী, কর্মের মেয়াদ, বরখাস্ত, কর্মবিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[৬] বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাজন ও তাদের অধঃস্তন দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় পদ সৃজন ও পদ বিলোপ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, সরকারি কর্মচারি নিয়োগ-পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন তথা কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও সংশোধনসহ কর্মকর্তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।[৭] বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুই স্তরবিশিষ্ট-উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর।[৮] উচ্চস্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয় যা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দ্বারা গঠিত এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যস্ত। উচ্চস্তরকে নীতিনির্ধারণী কেন্দ্রও বলা যায়। নিম্নস্তর হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যা সাধারণ প্রশাসন এবং মাঠ পর্যায়েসেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভৌগোলিকভাবে বিভাগ, জেলা ও থানা প্রশাসন এর অন্তর্ভুক্ত। জনপ্রশাসনের নিম্নস্তর হচ্ছে

মাঠ প্রশাসন।[৯] বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে- ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি ও ৪র্থ শ্রেণি। ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণি) সংখ্যা ১৩,৬২,২৯৮ জন।[১০]

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইন কানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার বেশকিছু নীতি এবং কৌশল প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২'প্রধান, যা রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল। শুধুমাত্র দুর্নীতি দমন নয়, বরং সমাজে ও রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণভিত্তিক একটি ব্যবস্থা তৈরি করার প্রত্যাশায় ২০১২ সালে এই কৌশল প্রণীত হয়।[১১] সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১-এ সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের একটি হলো 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি) "সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা" (লক্ষ্য ১৬.৫) ও "সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের" (লক্ষ্য ১৬.৬) বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাই জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১২]

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ, কার্যকর চর্চা ও সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। শুদ্ধাচার বলতে এই কৌশলটিতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা।[১৩] রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলো জীবনব্যবস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচারের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার চর্চার একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার হলো জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও বিশ্বাসের সর্বদা প্রতিপালন। ব্যক্তিস্বার্থ বা পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না - যদি কোথাও স্বার্থগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেখানে অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিবেন। সরকারি কর্মকর্তাদের অবশ্যই স্বচ্ছ ও আন্তরিক হতে হবে এবং ঊর্ধ্বতন ও সেবাগ্রহীতাদের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[১৪] বাংলাদেশের সংবিধানে 'সরকারি কর্মচারী' ও 'প্রজাতন্ত্রের কর্ম'-এর সংজ্ঞা অনুসারে 'সরকারি কর্মচারী' বলতে বোঝায় এমন কোনো ব্যক্তিকে, যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত; এবং 'প্রজাতন্ত্রের কর্ম' বলতে বেসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশের সরকার-সংক্রান্ত যে কোনো কর্ম, চাকরি বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলে ঘোষিত হতে পারে এমন কর্মকে বোঝায় (অনুচ্ছেদ ১৫২)।[১৫]

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে জনপ্রশাসন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করছে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করছে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' গঠিত হয়েছে। নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনপ্রশাসনকে অধিকতর স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব অধিকতর নিবিড়ভাবে তদারকি করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর সুষ্ঠুতা আনয়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১৬] জনপ্রশাসন হবে টেকসই উন্নয়নের বাহক এবং প্রধান নির্বাহী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করে মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত নিবেন এবং জাতীয় সংসদে নীতিমালা প্রণয়ন করবেন, যার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বা কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব হচ্ছে জনপ্রশাসনের।[১৭]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

আধুনিক জনপ্রশাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা।[১৮] জনপ্রশাসনের কর্তব্য হলো, যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। বাস্তবে বাংলাদেশে রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের মধ্যে প্রভেদ টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদেরা অনুগত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী চান, কারণ তারা প্রশাসনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চান। অন্যদিকে অনেক সরকারি কর্মচারী পদোন্নতি বা অন্যান্য সুবিধার উদ্দ্যেশ্যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়ে পড়েন। এইভাবে দলীয় রাজনীতি প্রশাসনকে সংক্রমিত করছে।[১৯] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' এবং 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' সম্মাননা পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন'। প্রধানমন্ত্রীকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হলে তা বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে প্রভাবিত করতে পারে, যেহেতুপ্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারপ্রধান নন, একটি দলেরও প্রধান। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, যারা মূলত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, তারা রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে পারেন না।[২০]

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)অর্জনে দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে মেধাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসনে সততার চর্চা এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত।[২১] সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী দেশে সুশাসনের ঘাটতির জন্য তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন - জনপ্রশাসনের দক্ষতার অভাব, দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, এবং অনিয়ম। জনপ্রশাসনের দক্ষতার ওপরই দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি নির্ভর করে। আমাদের দেশে সচিবালয় কেন্দ্রিক যে এককেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার গতিশীলতা, দক্ষতা, অনিয়মমুক্ত পরিবেশ দেশের উন্নতিকে তরান্বিত করতে পারে।[২২]

ভবিষ্যতে প্রশাসনের রাজনীতিকরণ অব্যাহত থাকলে যখন যে দল ক্ষমতায় আসবে তাদের সমর্থক আমলারা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাবে এবং তাদের দ্রুত পদোন্নতি হবে। ফলে যোগ্যতা এবং দক্ষতা খুব একটা বিবেচনায়নেওয়া হবে না। এর ফলে সরকারের দক্ষতা হ্রাস পাবে। আমলারা দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করবে। এই কারণে দুর্নীতি ও অনিয়ম আরো তীব্র হবার সম্ভাবনা থাকবে। আইনের শাসন দুর্বল হয়ে আসবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় আমলাদের দোষ-ত্রুটি হবে। এক কথায় ভবিষ্যতে প্রশাসনে নিরপেক্ষতা ও উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হবে।[২৩]

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণীত হওয়ার পর ছয়বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হলেও জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় এটি কীভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার কোন সার্বিক পর্যালোচনা এখনো হয় নি। ফলে জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চার ওপর একটি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণা হাতে নেওয়া হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য জনপ্রশাসনের কার্যক্রম পরিচালনায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাপেক্ষে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও চর্চা পর্যালোচনা করা।

১.৪ গবেষণার আওতা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল সরকারের যেসব নীতি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত সেগুলোর পর্যালোচনা এবং সেসব নীতি জনপ্রশাসনের প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রয়োগের চিত্র বা প্রয়োগের চর্চা এ গবেষণার প্রধান উপজীব্য। জনপ্রশাসনে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সকল দপ্তর, সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তারা এই গবেষণার আওতাভুক্ত, এবং সরকারের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন এ গবেষণার আওতার বাইরে।

সারণি ১:গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

মেয়াদ	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর জনপ্রশাসন সম্পর্কিত এগারোটি কৌশল	নীতি	চর্চা
স্বল্পমেয়াদী	১. প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী প্রদান	১১টি কৌশল বাস্তবায়নে বিদ্যমান আইনি প্রস্তুতি	জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে এ কৌশলগুলি সম্পর্কিত আইন, বিধি, নির্দেশনাগুলির প্রতিপালন ও চর্চা
	২. 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন		
	৩. পাবলিক সার্ভিসে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন		
	৪. বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন		
	৫. প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা		
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী	৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন		
	৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন		
	৮. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি		

৯. জ্যেষ্ঠতা,কৃতি,জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি

১০. সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন

১১. যৌক্তিক বেতন কাঠামো ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে কোনো কোনোক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উভয়ধরনের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, দুদক কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্য উপাত্তের প্রধান উৎসগুলি ছিল সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ইত্যাদি। গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নসহ গবেষণাটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের দশটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে একটি উল্লেখযোগ্য খাত-জনপ্রশাসনকে গবেষণার জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামোর জন্য দেখুন সারণি ১।

১.৬ গবেষণার সময়

২০১৮ সালের জুন হতে ২০১৯সালেরমার্চপর্যন্তসময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো

প্রতিবেদনটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি, এবং প্রতিবেদন কাঠামো; দ্বিতীয় অধ্যায়ে জনপ্রশাসনের বিবর্তন, ভূমিকা ও আইনি কাঠামো; তৃতীয় অধ্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের জনপ্রশাসন সম্পর্কিত কৌশলগুলি বাস্তবায়নে সরকারের আইনের চর্চা বিশ্লেষণ; চতুর্থ অধ্যায়ে জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় চ্যালেঞ্জ; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

জনপ্রশাসন: বিবর্তন, ভূমিকা ও আইনি কাঠামো

২.১ জনপ্রশাসন: বিবর্তন

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের কাঠামো ঔপনিবেশিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল থেকে একবিংশ শতকের বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাজের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা জনপ্রশাসনঔপনিবেশিক। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (আইসিএস)ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ব্যাপারটা মোটামুটি অসম্ভবই ছিল। কারণ ভারতীয়দের লন্ডনে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হতো এবং তাদের ইংল্যান্ডে দুই বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকতে হতো। আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড যাওয়া বিপুল খরচের ব্যাপারই শুধু ছিল না, সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধিনিষেধেরও সম্মুখীন হতে হতো। ভারতীয়সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাগুলো ১৯২২ সাল থেকে যুগপৎ ইংল্যান্ড ও ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়।[২৪]

দেশভাগের পর জনপ্রশাসন

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া জনপ্রশাসনই বহাল থাকে। সরকারি কাঠামোর উপর এর নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণে একচেটিয়া অধিকার, স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা, সর্বোপরি এর এলিট চরিত্র- সব কিছুই ছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য, পরে যা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে চর্চা হয়েছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মতো পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৬১ জন। ১৯৭০ সালে এ সংখ্যা হয় মাত্র ৬০১।[২৫]

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন

ঔপনিবেশিক ধাঁচে গড়া আমলাতন্ত্র দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের জনপ্রশাসন গঠিত হয়।এখানে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক রাজনৈতিক সরকার এবং প্রশাসন পরিচালক সরকারি আমলা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় হতে জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও গতিশীলতা, প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন, জনবল সুষমকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ১৮টি কমিশন/কমিটি গঠন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়নি।[২৬]সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন এবং কমিটিসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ২: সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন এবং কমিটিসমূহ

সাল	কমিশন/ কমিটির নাম	প্রধান বিষয়
১৯৭১	প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (এআরসি)	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সরকারের জন্য সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন
১৯৭২	প্রশাসনিক ও সার্ভিস কাঠামো পুনর্গঠন কমিটি	সার্ভিস কাঠামো
	জাতীয় বেতন কমিশন	বেতন কাঠামো
	বেতন ও সার্ভিস কমিশন	সার্ভিস কাঠামো ও বেতন সংক্রান্ত
১৯৮২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি	সরকারি সংস্থাসমূহের সংগঠন ও জনবল যৌক্তিকীকরণ
	প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি	জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন পুনর্গঠন
১৯৮৪	জাতীয় বেতন কমিশন	বেতন সংক্রান্ত
১৯৮৫	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি	পদোন্নতি সংক্রান্ত
	সিনিয়র সার্ভিস পুল কাঠামো পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি	সিনিয়র সার্ভিস পুল কাঠামো
১৯৮৭	মন্ত্রীপরিষদ উপ-কমিটি	সিনিয়র সার্ভিস পুল কাঠামো পর্যালোচনা ও পদোন্নতি
১৯৮৯	পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে কতিপয় সরকারি দপ্তর রাখার প্রয়োজনীয়তা পুনঃপরীক্ষা কমিটি	কতিপয় সরকারি দপ্তর রাখা না রাখা বিষয়ক
	জাতীয় বেতন কমিশন	বেতন সংক্রান্ত
১৯৯১	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন	স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা

সাল	কমিশন/ কমিটির নাম	প্রধান বিষয়
১৯৯৬	জাতীয় বেতন কমিশন	বেতন সংক্রান্ত
	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি	মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কাঠামো ও জনবল যৌক্তিকীকরণ
১৯৯৭	স্থানীয় সরকার কমিশন	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি
২০০০	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	জনপ্রশাসন সংস্কার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর সিভিল প্রশাসন পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মাঠপর্যায়ের ভেঙে-পড়া প্রশাসন পুনর্গঠনের সুপারিশ করা, পাকিস্তান সরকারের অধীনে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোতে আত্মীকরণ, প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। এই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে ২০টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনে ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি গঠিত হয়, কেননা তখনো সংবিধান প্রণীত হয়নি।[২৭]

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গঠন করা হয় চার সদস্যের প্রশাসনিক ও সার্ভিস পুনর্গঠন কমিটি। এই কমিটিকে বিদ্যমান সিভিল সার্ভিসকে পরীক্ষা করে সুপারিশ করা, সকল সিভিল সার্ভিসকে একটি অভিন্ন সার্ভিসে একীভূত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা এবং বিভিন্ন সার্ভিসের কর্মকর্তাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা, বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভাগে সরকার কর্মকর্তা নিয়োগের নীতিমালা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা ইত্যাদির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৮] কমিটি যথাসময়ে সুপারিশ দিলেও তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি।

এরপর ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয় যা 'রশিদ কমিশন' নামে পরিচিত।[২৯] কমিশনকে সিভিল প্রশাসনের কাঠামো এবং সেখানে যে বেতন-ভাতা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখে সুপারিশ রাখতে বলা হয়। সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রাদেশিক সরকারের আমলাদের একীভূত করা এবং নতুন কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্বও দেওয়া হয় এই কমিশনকে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৪টি মূল ক্যাডারের অধীনে ২৮টি সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়। বেতন-ভাতা সম্পর্কে সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ২১টি পে-স্কেল অনুমোদন করে।[৩০] রশিদ কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রস্তাব করে -সিনিয়র সার্ভিস পুল (এসএসপি) নামে একটি পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি করা যেখানে নিয়োগ হবে উপ-সচিব পর্যায়ে এবং তা সকল ক্যাডারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এই নিয়োগ হবে যদিও তা কখনো কার্যকর হয়নি।[৩১]

১৯৮৪ সালে তৃতীয় পে কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সুপারিশে আমলাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বেতন উল্লেখ করে ২০টি গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হয়। সরকার কিছুটা সংশোধন করে কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ১৯৮৯ সালে চতুর্থ পে কমিশন গঠন করে সকল পর্যায়ে এবং পাবলিক সেক্টরের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বাস্তবসম্মত বেতন কাঠামো সুপারিশ করতে বলা হয়। এবারও কমিশন ২০টি গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করে সুপারিশ করে। এরশাদের সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয় যেমন, সেক্রেটারি কমিটি, স্পেশাল কমিটি, কেবিনেট সাব কমিটি, কাউন্সিল কমিটি এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের জন্য জাতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)। জেনারেল এরশাদ সরকারের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীভূত করে উপজেলা পদ্ধতি প্রচলন করেন যার ফলে অনেক দপ্তরের অনেক কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের সরকার প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল নিয়োগ নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন বিষয়ে সুপারিশ রাখা, বিদ্যমান কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিধিবিধান নির্ধারণ ও মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হ্রাস করে জনবল কমিয়ে আনা।[৩২]

১৯৯৬ সালে পঞ্চম জাতীয় পে কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন আগের ২০ গ্রেডের বেতন-ভাতা অক্ষুণ্ণ রাখে তবে বেতনে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে জীবনধারণের মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। ১৯৯৭ সালে গঠিত হওয়া এটিএম শামসুল হকের কমিশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করে। এ কমিশন নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্টের (এনপিএম) ধারণা সংবলিত মোট ১৩৭টি সংস্কারের প্রস্তাব দেয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমমনা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে ক্লাস্টার সিস্টেমের প্রচলন করে কর্মকর্তাদের ওই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বদলি সীমিত করা। জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও পদায়নের জন্য সুপিরিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (এসএমপি) গঠন করা এবং কোটাপ্রথা বাতিল। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনশক্তির আধিক্য কমানো এবং স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়।[৩৩]

'পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম কমিশন (পার্ক)' ২০০০ সালে মন্ত্রণালয়গুলোকে বিভিন্ন গুচ্ছে বিভিক্ত করার জন্য কাজ শুরু করে। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সুশাসন বিষয়ক গুড গভর্নেন্স সেল তৈরি করা হয়। তখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

থেকে মন্ত্রণালয়গুলিকে পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। পরে অনুমোদনের জন্য এটি মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ প্রস্তাবিত পাঁচটির পরিবর্তে মন্ত্রণালয়গুলোকে ৪টি গুচ্ছে বিভক্ত করার অনুমতি দেয়। ২০০৪ সালে অনুমোদন দেওয়া এই প্রস্তাবের পর কোন মন্ত্রণালয় কোন গুচ্ছের অধীনে থাকবে তা নির্ধারণ করতে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু কোন অগ্রগতি হয়নি। এরপর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা উদ্যোগ নেওয়ার পর আবার তা যাচাই বাছাই শুরু হয়। যাচাই-বাছাই শেষে এবার মন্ত্রণালয়গুলো ছয়টি গুচ্ছে বিভক্তির সুপারিশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। কিন্তু সেখানেও কোন অগ্রগতি হয়নি।[৩৪]

২০০৫ ও ২০০৯ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম পে-কমিশন বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১১ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম হয় 'জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়'। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে নিয়ে গঠিত সর্বশেষ কমিশন যা অষ্টম বেতন ও চাকরি কমিশন নামে পরিচিত তা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল।[৩৫]

২.২ জনপ্রশাসনের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। সে নীতি নির্ধারণে তথ্য-উপাত্ত, নজির আর সম্ভাব্য সুবিধা-অসুবিধার বিষয়াদি জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারাই তাঁদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থেকে জনপ্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করেন। তাই বলা চলে, সরকারের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায়ও জনপ্রশাসন অন্যতম সহায়ক শক্তি। জনপ্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলি[৩৬] নিচে সন্নিবেশিত হলো-

- সিভিল সার্ভিসসমূহের নিয়ন্ত্রণ; শৃঙ্খলা, কার্যপ্রণালী ও তদন্ত, আপিল ও পর্যালোচনা; বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি এবং নির্বাচনী বোর্ড-এর গঠন ও কার্যাবলি; বিভাগীয় পরীক্ষা, সরকারি যানবাহনের ব্যবহার, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বিধি, প্রবিধিমালা এবং আদেশসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান। সংবিধান, আইন, বিধি, প্রবিধানের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের অধিকার সংরক্ষণ।
- সিভিল সার্ভিসের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন; জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর এবং অধস্তন অফিসসমূহের পরিদর্শন এবং পর্যালোচনা। সরকারি অফিসের জনবল কাঠামো ও যন্ত্রপাতি এবং উপকরণাদি পুনঃবীক্ষণ/পর্যালোচনা ও সংশোধন; সরকারি কর্মচারীগণের কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- বেসামরিক পদে জনবল নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি।
- প্রশাসনিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কার; কর্মকর্তাগণের চাকরি-রেকর্ডের ইতিহাস, জ্যেষ্ঠতা তালিকা, হালনাগাদ পদায়ন (নিয়োগ ও প্রেষণ তালিকা) তালিকার প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ; সচিবালয় রেকর্ড রুম ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ। কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান সংকলন।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে (১) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় (২) জেলাপ্রশাসকের কার্যালয় এবং (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর এবং অধস্তন অফিসসমূহ দ্বারা উন্নতমানের জনমুখী সেবা প্রদান।
- সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের অধীনে কর্মসম্পাদনে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে সহায়তা।

২.৩ জনপ্রশাসনের আইনি কাঠামো

সরকারের জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বেশ কিছু আইনিকাঠামো বিদ্যমান। সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ সৃষ্টি ও পুনর্গঠন, সংযুক্তকরণ, নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করেছে, যেমন সরকারি চাকরি আইন,২০১৮; সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯; সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫; বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ(বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪; উপসচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২;বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩ ইত্যাদি। যেহেতু সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সবসময় জনগণের সেবা করবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য তাই দক্ষ, জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এসব বিধানাবলি প্রণীত হয়েছে।

অধ্যায় তিন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত কৌশল বাস্তবায়ন:আইনি কাঠামো ও চর্চা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তাদের মধ্যে জনপ্রশাসন অন্যতম।[৩৭]

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হলেও এটা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৭ সালে। সেসময় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গুড গভর্নেন্স প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতো। এই প্রকল্পের অধীনে সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এডিবি একটি নীতি নির্ধারণী চাপ দিয়ে আসছিল যাকে ডলোউইচ ও মার্স মডেল (ডলোউইচ ও মার্স ২০০০) অনুসারে 'কোআরসিভ পলিসি ট্রান্সফার' বলা হয়। এডিবি কৌশলপত্র প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে কারিগরি সহায়তার জন্য ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস)-কে নিযুক্ত করে। আইজিএস নাগরিক-কেন্দ্রিক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের জন্য মোট ৬১টি পরামর্শ সভার আয়োজন করে।[৩৮] শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে ২৯ নভেম্বর ২০১২।[৩৯]২০১৩ সালের২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যেসবসিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে একটি করে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন, কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ, অন্তরায় দূর করার পরিকল্পনা প্রণয়ন, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করা অন্যতম। [৪০]

জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ওই কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকান্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কৌশলটিতে জনপ্রশাসনের জন্য পাঁচটি স্বল্পমেয়াদি এবং ছয়টি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী বলতে এক বছর, মধ্যমেয়াদী বলতে তিন বছর ও দীর্ঘমেয়াদী বলতে পাঁচ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে সরকারের কি কি আইনি প্রস্তুতি রয়েছে তা এক নজরে নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে সরকারের আইনি প্রস্তুতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ	বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নির্দেশনা
স্বল্পমেয়াদী কৌশল	
১. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী জমাদান	সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯
২. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন	জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১
৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮)
৪. বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা	বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি (খসড়া) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০১৫
৫. শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল	
৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন	সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'	সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
৮. প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ	বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নির্দেশনা
৯. জ্যেষ্ঠতা,কৃতি,জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন	উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮
১০. ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন)আইন, ২০০৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮
১১. যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান	অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে সরকারের কী কী আইনি প্রস্তুতি রয়েছে এবং তা কিভাবে চর্চা হচ্ছে তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

৩.১ কৌশল-১: "প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী প্রদান"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত প্রথম সুপারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনটি হচ্ছেসরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, যা বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিভাগে (দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে) কর্তব্যরত বা ছুটিরত সকল সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সরকারের অন্য যেকোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রেষণে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য।সরকারি কর্মচারী বলতে বোঝানো হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি।[৪১] এই বিধিমালার উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিশোধমূলক নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নিশ্চিত করা। "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯"-বিধিমালায় দুইভাবে সম্পদের হিসাব প্রদানের উল্লেখ আছে-

- চাকরিতে প্রবেশের সময়: যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানা বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি মূল্যের অলংকারসহ সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা করতে হবে (বিধি-১৩)।নগদ টাকায় সহজে পরিবর্তনীয় সম্পদের হিসাবও প্রকাশ করতে হবে (বিধি-১৩)।
- প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর ডিসেম্বর মাসে সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব প্রদান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লেখ আছে- প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতে হবে। "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯"- এ আরও উল্লেখ আছে আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যবসা বা আবাসিক ব্যবহারের অভিপ্রায়ে নিজে বা ডেভেলপারের দ্বারা কোন ভবন বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করতে পারবে না (বিধি-১২)।

চর্চা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে প্রবেশের সময় "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯" অনুযায়ী সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রদান এবং সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বৈধ আয়ের উৎস প্রদর্শন করার বাধ্যবাদকতারয়েছে।১৯৭৯ হতে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারিদের সম্পদের হিসাব প্রদানের কোন কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি। এ বিষেয়ে একজন সাবেক কেবিনেট সচিব উল্লেখ করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০৮) সময় এ বিষয়ে উদ্যেগ নেওয়া হয়েছিল এবং অধিকাংশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেসময় জনপ্রশাসন সচিব বরাবর সম্পদের বিবরণী প্রদান করা হয়েছিল।[৪২]

এরপর ২০১০ সাল হতে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা চাকরিতে যোগদানের সময় নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদের হিসাব প্রদান করে আসছেন। অতি সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় সতের হাজারেরও অধিক কর্মচারীদের (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) সম্পদের হিসাব নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেকিন্তু এ কার্যক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তারা সম্পদের হিসাব প্রদান করেন নি। এছাড়া প্রতি৫ বছর অন্তর অন্তরডিসেম্বর মাসে সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব প্রদানের চর্চার দৃষ্টান্ত নেই। শুদ্ধাচার কৌশলে

উল্লেখিত প্রতিবছর সম্পদের বিবরণী প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।সরকারের পূর্বানুমোদন না নিয়ে কর্মকর্তাদের একাংশ বাড়ি নির্মাণ করছেন বা ফ্ল্যাট কিনছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব সম্পত্তি স্ত্রী ও সন্তানের নামে কেনার প্রবণতা বিদ্যমান।

৩.২ কৌশল-২: "বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

২০১১ সালের জুন মাসে "জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১" জাতীয় সংসদে পাস হয়। আইনটির উদ্দেশ্য হলো, জনস্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তি যদি সরকারি- বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করেন, তাঁকে সুরক্ষা প্রদান। এ আইনের ২(৪) ধারায় যে বিষয়গুলিকে 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেগুলি হলো, সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়; সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা; সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ; সরকারি সম্পদ অপচয়; ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা; ফৌজদারি অপরাধ বা বেআইনি বা অবৈধ কার্য সম্পাদন; জনস্বার্থ, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ও দুর্নীতি বিষয়ক তথ্য।[৪৩] ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এ "জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭" প্রণীত হয়।

তথ্য প্রকাশকারী(হুইসেলব্লোয়ার) হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান আবশ্যক। এ ঝুঁকি হতে তথ্য প্রদানকারীদের পরিচয় গোপন রাখার বিধানও এই আইনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও এ বিধানে সংযোজিত হয়েছে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি, দেওয়ানি, বিভাগীয় মামলা দায়ের বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসত্য তথ্য প্রকাশ করে কাউকে হয়রানি করলে তথ্য প্রকাশকারীর জন্য শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে আইনে।

চর্চা

'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' প্রণীত হলেও এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। গবেষণার সকল মুখ্যতথ্যদাতা উল্লেখ করেন, আইন প্রণয়নের স্বার্থকতা নির্ভর করে তা বাস্তবায়নের ওপর। এই আইনটি ব্যবহার করে কোনো অভিযোগ প্রদানের তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

৩.৩ কৌশল-৩: "পাবলিক সার্ভিসে Grievance Redress System-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল সময়ে জনগণের সেবা করবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন,২০০০ এর প্রতিবেদনেও কেন্দ্রীয়ভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।এছাড়া সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০১৪ এর অষ্টম অধ্যায়ে ২৬২ নং নির্দেশে নাগরিকদের অভিযোগসমূহ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে নিষ্পত্তি এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংক্ষণের অনুশাসন রয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা,২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) প্রণয়ন করেছে।

এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৩২ ধারায় উল্লেখ আছে, এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং অসদাচরণের দায়ে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়ী হবে। "অসদাচরণ" বলতে এখানে শৃঙ্খলার হানিকর আচরণ বা শিষ্টাচারহীন কোন আচরণ বা সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থী আচরণ বোঝায়। এ ছাড়াও অসদাচরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: (১) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসম্মত নির্দেশ অমান্য করা; (২) কর্তব্যকর্মে অবহেলা; (৩) আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সরকারি কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশপত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং (৪) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে অসৌজন্যমূলক, বিভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন বা তুচ্ছ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করা। এই বিধিতে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে অযোগ্যতা, অসদাচরণ, ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি, দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যক্রম। শাস্তির প্রকৃতি দু ধরনের- লঘু ও গুরু। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অতি সম্প্রতি হালনাগাদ হয়ে এখন সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ পরিণত হয়েছে।

চর্চা

জনপ্রশাসনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা দুটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয় - জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কার্যরত জিআরএস পদ্ধতিতে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃঙ্খলাভঙ্গ/আচরণজনিত অভিযোগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারি সেবা নিতে গিয়ে নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা, বা কোনো সরকারি দপ্তর অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে করতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, ২০০০ এর সুপারিশের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তরসমূহকেও এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় মূলত ২০০৭ সাল হতে।[৪৪]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তরসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিটি সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।
- ২০০৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি সংস্থাগুলিকে অভিযোগ নিরসন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য পরিপত্র জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।[৪৫]
- ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিল, অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও ফোকাল পয়েন্ট এর পূর্ণ ঠিকানা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের নির্দেশ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।[৪৬]
- ২০০৯ সালের ১৯ জুলাই অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ বিষয়ে আর একটি পরিপত্র জারি করে।[৪৭]
- ১০১১ সালে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য অভিযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশে অনলাইনভিত্তিক জিআরএস প্রবর্তনের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) এখন নাগরিকেরা ব্যবহার করতে পারছে।[৪৮]
- ২০১২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আর একটি পরিপত্রের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ-নিষ্পত্তি কার্যক্রম ও এ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্যাদি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়।[৪৯]
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেইটে কেন্দ্রীয়ভাবে জনসাধারণের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র চালু করে।

মন্ত্রিপরিষদের ব্যবস্থাপনায় 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫' এ তিন ধরনের অভিযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে[৫০]-

- **নাগরিক অভিযোগ:** সরকারি দপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কেঅসন্তুষ্টি।
- **কর্মকর্তা কর্মচারী অভিযোগ:** সরকারি দপ্তরে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে তাঁর প্রাপ্য যেকোন সেবা বা বৈধ অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট বা সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিকারের জন্য আবেদন দাখিল করলে তা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেনশন, আনুতোষিক, আর্থিক সুবিধা-সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগও এ শ্রেণির অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত হবে।
- **দাপ্তরিক অভিযোগ:** কোনো সরকারি দপ্তরের আওতাভুক্ত অথবা প্রতিশ্রুত সেবা বা পণ্য এবং/অথবা সেবা প্রদান পদ্ধতি বা বৈধ অধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোনো দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন দাপ্তরিক অভিযোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সারণি ৪: জিআরএস পদ্ধতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ

বছর	পূর্ববর্তী বছরের জের	গৃহীত অভিযোগ	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
২০১৪-২০১৫	---	১০,২৮২	১০,২৮২	৪৯৫২	৫৩৩০
২০১৫-২০১৬	৫,৩৩০	৪,২৫০	৯,৫৮০	৪৫২৪	৫০৫৬
২০১৬-২০১৭	৫,০৫৬	৭৬৭	৫,৮২৩	৩৮৭৫	১৯৪৮
২০১৭-২০১৮	১,৯৪৮	১০২৪৩	১২,১৯১	৮৪৪৬	৩৭৪৫

তথ্যসূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েঅভিযোগ প্রতিকারের সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাটি মূলত সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত। এ পদ্ধতিতে অভিযোগ প্রদানের সুনির্দিষ্ট কোন ফরমেট/ফরম নেই কিন্তু সচিব বরাবর অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিকট সাদা কাগজে লিখিত ও ই-মেইলে অভিযোগ প্রদান করা যায়। অভিযোগ প্রতিকারের পর অভিযোগকারীকে তা জানানো হয়। মাঠ পর্যায় থেকেও অভিযোগ দায়ের করা যায়। কোনো মন্ত্রণালয় হতে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যখন জনপ্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করা হয়, প্রাথমিক যাচাইয়ের পর প্রয়োজন সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়। এরপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। অভিযোগ প্রমানিত হলে বিভাগীয় মামলা হয়। অভিযোগ নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।[৫১] জনপ্রশাসন কর্মকর্তারা অভিযোগ নিষ্পত্তি হওয়ার হার সন্তোষজনক বলে দাবি করেন। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমন্বিত প্রতিবেদন প্রতিমাসে নির্ধারিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান করা হয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়।

দুদকে অভিযোগ

এছাড়া সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম, দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা জনিত বিষয়েদুদকেও সরাসরি অভিযোগ করা যায়। সম্প্রতি দুদকএ বিষয়ক হটলাইন চালু করেছে ।গত কয়েক বছরে (২০১৪-১৭) দুদক পরিচালিত ফাঁদে ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার ৪৬ জন সরকারি কর্মকর্তা।

সারণি ৫: অনিয়ম, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে দুদক কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত সরকারি কর্মকর্তা

সাল	সংখ্যা
২০১৬	১৬৮
২০১৭	৮৪
২০১৮	২৭

৩.৪ কৌশল-৪: "একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি(APA-Annual Performance Agreement)প্রণয়নের পর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলি তা বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পড়ে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তার জন্য একটি অভিন্ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থার। এ কারণেইকৃতিভিত্তিককর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি-পিবিইএস(Performance Based Evaluation System-PBES)প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোমধ্যে এটির খসড়া প্রণীতহয়েছে। প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ ও জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ কার্যকর করা হয়েছে।

চর্চা

পিবিইএস

পিবিইএস হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও পদায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত এসিআরের পরিবর্তে পিবিইএসপ্রণয়ন করা হয়েছে, তবে এর কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং অধিকতর কর্মোদ্যোমী হওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয়প্রতিবেদনের (এসিআর) পরিবর্তেকৃতিভিত্তিক কর্ম-মূল্যায়ন ব্যবস্থার আওতায় এই কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।[৫২]নিম্নলিখিত প্রধান দুইটি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পিবিইএস এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।

১. এসিআর অনেক পুরানো একটা ব্যবস্থা, যা একজন সরকারি কর্মচারীর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সম্পর্কে তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার লিখিত প্রতিবেদন। কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ছাড়াও এতে প্রতিবেদনাধীন কর্মকর্তার চরিত্র, আচরণ ও সততা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয়। পাকিস্তান আমলেও এসিআর প্রথা চালু ছিল। ১৯৭৪ সালে এ ফরম বাংলায় ছাপা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার পরিবর্তন হলেও ১৯৯০ সাল হতে এ পরিবর্তিত ফরম অদ্যাবধি চালু রয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে চালু ফর্ম এ গ্রেডিং-এর মানক্রম হলো: অসাধারণ ৯৫-১০০, উত্তম ৮৫-৯৪, ভাল ৬১-৮৪, চলতি মান ৪১-৬০ এবং চলতি মানের নিচে হচ্ছে ৪০ ও তার কম।[৫৩] অধস্তন কর্মকর্তার কাজের মূল্যায়ন করার জন্য এটি একটি একপক্ষীয় এবং অস্বচ্ছ ব্যবস্থা,[৫৪] কারণউর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সুপারভাইজার) কাজের কী মূল্যায়ন করলেন তা সুপারভাইজির কাছে অপ্রকাশিত থাকে।
২. সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা,২০১৫-২০১৬[১]প্রণয়ন করে। সরকার মন্ত্রণালয়গুলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতি আরও বেশি জবাবদিহি করার জন্য এপিএ(APA) প্রচলন করেছে। এপিএ হচ্ছে মূলত মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলির বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা যা মন্ত্রিপরিষদে জমা দেওয়া হয়। সুতরাং মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলি মন্ত্রিপরিষদের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পড়ে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তার বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা। মূলত এরই ধারাবাহিকতায় নতুনভাবে কর্মকর্তাদের কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতিও প্রচলন করার আবশ্যকতা দেখা দেয় এবং পিবিইএস প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে বলা হয়, বছরের প্রথমেই কর্মকর্তা তার সুপারভাইজারের সাথে বসে তার এক বছরের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। এই কর্মপরিকল্পনাটা দুজন মিলে করবেন এবং ছয় মাস পর সুপারভাইজার আবারও একবার নিরীক্ষা করে দেখবেন কর্মকর্তা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করছেন কিনা। সুপারভাইজার নিয়মিত তদারকিও করবেন। নম্বর প্রদানের বিষয়টা এখানে স্বচ্ছ যেহেতু কি কি কাজ করবেন তা দুজন বসেই নির্ধারণ করেছেন এবং সুপারভাইজার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। মোট ১০০ নম্বরের ভিত্তিকে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিবিইএস-এর পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া (piloting) সম্পন্ন হয়েছে। তবে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের জন্য এখন পর্যন্ত পূর্বের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) প্রচলিত রয়েছে।

প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন

জনপ্রশাসন পদক: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থায় এবং জেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীরতাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে প্রণোদনা প্রদান করার ব্যবস্থা হিসেবে ২০১৬ সাল হতে জনপ্রশাসন পদক প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত) প্রণীত হয়েছে।জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জনমুখীপ্রশাসন গড়ে তোলা, সুবিধাভোগীদের চাহিদারভিত্তিতে সৃজনশীলতা ও অভিযোজন মূল্যায়ন করা, এবং জনসেবা প্রদান পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমে আস্থাশীল জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।[৫৫]জনপ্রশাসন পদক এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

- পুরস্কারের ক্ষেত্র হিসেবে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতকে বেছেনেওয়া;
- পদকের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদেরমনোনীত করা;
- একটি ক্যাডারের (বিসিএস-প্রশাসন) সদস্যদের অধিকাংশ পদকপ্রাপ্তি; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীতে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশাসনিক কার্যালয় যথা- প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আইসিটি বিষয়ক প্রকল্প ও কার্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া।

জনপ্রশাসন পদক প্রদানের ক্ষেত্রগুলো হল সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কার ও গবেষণা (সামাজিক), বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গবেষণা (বিজ্ঞানভিত্তিক)। নীতিমালা অনুসারে সাধারণ ও কারিগরি দুটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে তিন শ্রেণীতে ১টি করে মোট ৬টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। শুদ্ধাচারের ১৮টি সূচকের ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কারের জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্ধারিত ১৮[২]টি সূচকে ৯০ নম্বর এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দফতর/সংস্থার ধার্য করা

---

[১]সরকারি কার্যক্রমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদের প্রতি সরকারি মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে অনেক বেশী দায়বদ্ধ করার তাগিদে একটি কর্মসম্পাদনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এক বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রদান করেন মন্ত্রিপরিষদে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি প্রষ্ঠিানকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

[২]শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকের মধ্যে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতায় নম্বর ৫, সততার নিদর্শনে ৫, নির্ভরযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় ৫, শৃঙ্খলাবোধে ৫, সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণে ৫, সেবা গ্রহীতার সঙ্গে আচরণে ৫, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতায় ৫, সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতায় ৫, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতায় নম্বর ৫। এছাড়া পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতায় ৫, ছুটি গ্রহণের প্রবণতায় ৫, উদ্ভাবন চর্চায় ৫, বার্ষিক

অন্যান্য কার্যক্রমে ১০ নম্বরসহ মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা হয়েছে। নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, পুরস্কারের জন্য বিবেচ্য কর্মচারীকে প্রতি অর্থবছরে ন্যূনতম ছয় মাস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে হবে। কোনো চাকরিজীবীর গুণাবলীর সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কোনো কর্মচারী যেকোনো অর্থবছরে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩ অর্থবছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

দেশে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ বিতরণ অনুষ্ঠান হয় ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই। সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তিগত, দলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীতে জনপ্রশাসনের ৩০ জন কর্মকর্তা (১৩ জন জাতীয় পর্যায়ে এবং ১৭ জন জেলা পর্যায়ের)জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ পদক লাভ করেন। ২০১৭ সালে ২৬ জন জনপ্রশাসন পদকের জন্য মনোনীত হন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী ধারণাকে কাজে লাগিয়ে নাগরিক সেবা সহজীকরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৯ ব্যক্তি ও ৩ প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রশাসন পদক-২০১৮ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারা কৃতিত্বের জন্য নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন, অন্যন্য কর্মকর্তাদের মাঝেও কাজের স্পৃহা বাড়বে। এটি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এটি একটি প্রেষণা। তবে এ পদক প্রদান শুদ্ধাচার চর্চায় কতটা সুফল রাখবে তার এখনই চূড়ান্ত বিবেচনা সম্ভব নয় কারণ মাত্র তিনবছর হলো এটি প্রয়োগ হচ্ছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ দিতে পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজন্য 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।[৫৬] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৭ এর ৩ এপ্রিল নীতিমালাটি জারি করেছে। প্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যেতে মাঠ পর্যায় থেকে প্রশাসনের সচিব পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো এ পদক প্রদান হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয় নীতিমালা অনুসরণ করে স্ব স্ব উদ্যেগে এই পুরষ্কার প্রদান করে থাকেন।

উপসচিবদের গাড়ি ক্রয় বাবদ ঋণ সুবিধা: ২৫ আগস্ট ২০১৭ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৭ (সংশোধিত)' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এর ভিত্তিতে উপসচিব থেকে উচ্চপদের সরকারি চাকরিজীবীদের গাড়ি কেনার জন্য সরকার এককালীন ৩০ লাখ টাকা করে ঋণ দিচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০১৭ এর ২৫ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। আবার গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, তেল খরচ ও চালকের বেতনবাবদ তাঁদের আরও প্রদান করা হচ্ছে মাসে ৫০ হাজার টাকা। ২০১৭ এর ২৫ সেপ্টেম্বর আর একটি প্রজ্ঞাপনে তা জানানো হয়। সুবিধাগুলো দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অবশ্য জুন ২০১৭ থেকে। উচ্চপদের সরকারি চাকরিজীবীদের 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা' বলা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুগ্ম সচিব থেকে জ্যেষ্ঠ সচিবেরা। ২০১৭ এর ১১ জুন উপসচিবদেরও গাড়ি ব্যবহারের দিক থেকে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘোষণা করে সরকার।[৫৭]গাড়িঋণ বিষয়ক প্রণোদনার পেছনে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গাড়িঋণ সুবিধা বাবদ ১,৬৯৭ জন উপসচিবের জন্য ৫০৯ কোটি ১০ লাখ টাকা এবং প্রতিমাসে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা হিসাবে বছরে সরকারের খরচ হবে ১০১ কোটি ৮২ লাখ টাকা।

বাংলা নববর্ষ ভাতা: সরকারি চাকরিজীবীদের ২০১৬ সাল হতে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেওয়া শুরু করেছে সরকার। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষক ও বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত প্রায় ২০ লাখ চাকরিজীবী ও পেনশনার এবং পারিবারিক পেনশনাররা এর আওতাভুক্ত। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৬ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ২০১৬ (বাংলা ১৪২৩) হতে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় বেতনস্কেলের আওতাভুক্ত সব কর্মচারী (সামরিক ও বেসামরিক) প্রতি বছর মার্চ মাসের মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা পাচ্ছেন।[৫৮]

পেনশনের হার: পেনশনের হার সর্বশেষ মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগের স্থলে ৯০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বেতনের ৩.৭৫% থেকে ৫% হারে ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পেনশনযোগ্য চাকরিকাল প্রচলিত ১০ থেকে ২৫ বছরের স্থলে ৫ থেকে ২৫ বছরে পুনঃনির্ধারিত করা হয়েছে। পেনশনের সর্বোচ্চ মাসিক ৪০ হাজার ৫০০ টাকার স্থলে ৭০ হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ আদেশ ১জুলাই২০১৫ সাল হতে কার্যকর হচ্ছে।[৫৯]

কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতায় ৫, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে ৫, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহে ৫, উপস্থাপন দক্ষতায় ৫, ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহে ৫ ও অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতায় ৫ নম্বর। তথ্যসূত্র: জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ: চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫৯ থেকে ৬০ বছর এবং অন্যান্যদের ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। এ আদেশ ১জুলাই২০১৫ সাল হতে কার্যকর হচ্ছে।[৬০]

অন্যান্য প্রণোদনা: কর্মচারীদের অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাসের ছুটি নগদায়নের স্থলে ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আনুতোষিক হার প্রতি ১ টাকার বিপরীতে ২০০ টাকার স্থলে ২৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।[৬১]এছাড়া মোবাইল ফোন কিনতে পাবেন ৭৫ হাজার টাকা। সরকারি চাকুরেদের গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে। সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ। ঋণগ্রহীতা কর্মচারী ব্যাংক রেটের সমহারে (বর্তমানে যা ৫ শতাংশ) সুদ পরিশোধ করবেন। সুদের অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করছে। তবে কোনো সরকারি চাকুরের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় বা দুর্নীতি মামলা থাকলে সেই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ঋণ পাবেন না। চাকরি স্থায়ী হওয়ার পাঁচ বছর পর থেকে এ ঋণ নেয়া যাবে। সর্বোচ্চ ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণ নেয়া যাবে। সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর, পরিদফতর ও কার্যালয়গুলোতে স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারীরাও এ সুবিধা পাবেন। সামরিক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, পৃথক বা বিশেষ আইনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীরা এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন না।[৬২]

অতি সম্প্রতি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়ানো হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে যুগ্মসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীরা এক ঘণ্টা ক্লাস নিলে ভাতা পাবেন ২ হাজার ৫০০ টাকা (পূর্বে পেতেন ১ হাজার ২০০ টাকা), উপসচিব এবং তার নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা ভাতা পাবেন ২ হাজার টাকা (পূর্বে পেতেন ১ হাজার টাকা)। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। এতদিন গ্রেড-৯ থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মচারীরা প্রতিদিন প্রশিক্ষণ ভাতা পেতেন ৫০০ টাকা। নতুনভাবে এটিকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে।[৬৩]

৩.৫ কৌশল -৫: "প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

নিয়োগ বিষয়কনীতি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালায় নিয়োগের ক্ষেত্রেই নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি নিয়োগ দুই ধরনের - সরাসরি মনোনয়নের মাধ্যমে ও পদোন্নতির মাধ্যমে।

মনোনয়নের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কোনো ব্যক্তি সরাসরি চাকরিতে নিয়োগের যোগ্য হবেন না এবং ঐ ব্যক্তিকেও নিয়োগ দেওয়া যাবে না যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কাউকে বিয়ে করেছেন বা বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন;

(খ) কোনো মনোনীত ব্যক্তিই চাকরিতে নিয়োগের যোগ্য হবেন না, যদি বিধি অনুসারে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক তাকে শারীরিকভাবে যোগ্য ঘোষণা করা না হয়;

(গ) যথাযথ সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর প্রাক-কার্যক্রম তদন্ত করে তা সন্তোষজনক হতে হবে;

(ঘ) কোনো ব্যক্তিকে চাকরিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাবে না যদি ঐ ব্যক্তি সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নির্ধারিত ফিসসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে না থাকেন। যেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সরকারি চাকরি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে বহাল রয়েছেন তাদের যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সব কর্মচারীকেই দুবছর এবং পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে এক বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে চাকরি করতে হয়। চাকরিতে নিয়মিতকরণের শর্ত হলো সাফল্যের সঙ্গে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া।[৬৪]

পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়টি প্রধানত নির্ভর করবে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড বা ক্ষেত্রবিশেষে গঠিত বিশেষ পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ওপর। নিম্ন কোনো পদ থেকে ক্যাডারভুক্ত প্রাথমিক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পদোন্নতির নির্দেশ প্রদানের আগেই সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অপরাপর শর্ত হচ্ছে পদোন্নতি পরীক্ষা ও সন্তোষজনক ফলাফলের রিপোর্ট।

কোটা বিষয়কনীতি: সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, (১) 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।' (২) 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' (৩) 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'[৬৫]আবার সংবিধানের ২৮(১) এ বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'[৬৬]২৮ (৪)'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[৬৭]সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদ আরও পরিষ্কার করে বলেছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।' (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'[৬৮]কিন্তু নিয়োগে দীর্ঘদিন কোটা পদ্ধতি বিরাজমান ছিল। ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটা পদ্ধতি তুলে দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে পরিপত্র জারি করে। কোটাব্যবস্থায় জেলাগুলোর জন্য ১০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধাকোটা রয়েছে ৩০ শতাংশ।[৬৯]

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগবিষয়কনীতি:প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ জনপ্রশাসনের একটি ভিন্নধর্মী নিয়োগ। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা ছিলনা। ১৯৭৪ সালের গণকর্মচারী অবসর আইনের ৫(৩) ধারা অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে পারেন।[৭০] সংশ্লিষ্টরা বলছেন এই আইনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সরকারি কাজে যদি কাউকে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ওই কর্মচারী অবসরে চলে যাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে।[৭১] হতে পারে কোনো একজন কর্মকর্তাকে দিয়ে একটা বিশেষ কাজ করেছিল সরকার। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন হতে আরও কয়েক মাস বাকি থাকলেও ওই কর্মকর্তা বা কর্মচারী এখনই অবসরে চলে যাচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা যেতে পারে। সম্প্রতি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বিষয়ে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯(১) এ উল্লেখ করেছে, "রাষ্ট্রপতি, জনস্বার্থে, কোনো কর্মচারীকে, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর, সরকারি চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবেন"।[৭২]

চর্চা

নিয়োগ পদ্ধতি

সরকারি চাকরি নিয়োগ বিধিমালায় দু'ধরনের নিয়োগ স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমটি হলো সরাসরি মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ এবং দ্বিতীয়টি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬: বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা[৭৩]

পদ	মোট পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১ম শ্রেণি	২,০৩,৪৭৪	১,৫৪,৬৮১	৪৮,৭৯৩(২০%)
২য় শ্রেণি	১,৮২,৯৬১	১,১৭,৮৭৮	৬৫,০৮৩(১৯%)
৩য় শ্রেণি	১০,৪০,৬৬৭	৮,৩৩,৯০৭	২,০৬,৭৬০(১৮%)
৪র্থশ্রেণি	৩,৩৫,০৯৩	২,৫৫,৮৩২	৭৯,২৬১(১৯%)
মোট	**১৭,৬২,১৯৫**	**১৩,৬২,২৯৮**	**৩,৯৯,৮৯৭(২৩%)**

বর্তমানে পদ শূন্য রয়েছে ২৩ শতাংশ। এসব পদে নিয়োগের বিশেষ কোন প্রস্তুতি নেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। গত ছয় বছরে শূন্যপদের হার ছিল ১৮ থেকে ২৩ শতাংশ। সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমপর্যায় পদে ৩১% ও সহকারি সচিব ও সমপর্যায় পদে ২৯% পদ শূন্য রয়েছে(সারণি ৮)। অন্যদিকে উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব পদে ১০০% এর অধিক নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে(সারণি ৭)।জনপ্রশাসনে উর্ধ্বতন পদসমূহে (উপসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে অধিক নিয়োগ করা হয়েছে।

সারণি ৭:উর্ধ্বতন পদসমূহে (উপসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে অধিক নিয়োগ[৭৪]

পদ	মোট পদ সংখ্যা	কর্মরত (২ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত)
উপসচিব	১,০০৬	১,৬৯৭
যুগ্ম সচিব	৪১১	৮৬২
অতিরিক্ত সচিব	১২১	৪৯৬

সারণি ৮: গ্রেড ৯ থেকে গ্রেড ৬ পর্যন্ত পদসমূহে নিয়মিত পদের বিপরীতে সীমিত নিয়োগ[৭৫]

কার্যালয়	সিনিয়র সহকারি সচিব ও সম-পর্যায়(গ্রেড৬)			গ্রেড৭			গ্রেড৮			সহকারী সচিব ও সম-পর্যায় (গ্রেড৯)		
	মোট পদ	কর্মরত	পদ শূন্য	মোট পদ	কর্মরত	পদ শূন্য	মোট পদ	কর্মরত	পদ শূন্য	মোট পদ	কর্মরত	পদ শূন্য
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	১,৩৯৬	৮০৫	৫৯১	৫৯	৭৪	-১৫	১২	৮	৪	১০৬৭	৭৪২	৩২৫
অধিদপ্তর	২৪,৪৭৭	১৮,২২৬	৬,২৫১	৩,৮১১	২,৮৫৯	৯৫২	৪,৩৩০	৪,০২৩	৩০৭	৫৮,২৪১	৪১,০৬৫	১৭,১৭৬
বিভাগীয় কমিশার, জেলাপ্রশাসক,উপজেলা নির্বাহী ও ভূমি অফিস	১,০০৫	৬১৩	৩৯২	১৫২	৭১	৮১	৩৬৫	৩৭২	-৭	৭০৩	৫৭২	১৩১
মোট	২৬,৮৭৮	১৯,৬৪৪	৭,২৩৪ (২৭%)	৪,০২২	৩,০০৪	১,০৩৩	৪,৭০৭	৪,৩৯৬	৩১১	৬০,০১১	৪২,৩৭৯	১৭,৬৩২ (২৯%)

কোটা পদ্ধতি

কোটা পদ্ধতি নিয়েবিতর্ক তখনই শুরু হয় যখন ৫০ ভাগেরও বেশি পদ কোটার জন্য সংরক্ষিত থাকে, এবং ফলে প্রকৃত মেধাবীদের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।[৭৬] স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যকবার কোটারপরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রচলন হয় ১৯৭২ সালে, যা১৯৭৫ সালে বাতিল হয়। ১৯৯৬ সালে আবার মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রবর্তন হয়। ১৯৯৭ সালের এক পরিপত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র ও কন্যার ক্ষেত্রে কোটা-সুবিধা বলবৎ করা হয়। ২০১০ সালে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে উক্ত পদগুলো খালি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সালে জেলা কোটার পদ জেলা থেকে পূরণ করা সম্ভব না হলে জাতীয় মেধাতালিকা হতে পূরণ করার নির্দেশ জারি করা হয়। ২০১১ সালের এক পরিপত্রে উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে তাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। ২০১২ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সব পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের এবং কোনো সংরক্ষিত কোটায় পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে তা থেকে ১ শতাংশ যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীর দ্বারা পূরণের পরিপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে কোটার কোনো পদ যোগ্য প্রার্থীর অভাবে পূরণ করা সম্ভব না হলে তা মেধাতালিকার ক্রমানুসারে পূরণ করার পরিপত্র জারি করা হয়। বিভিন্ন সময়ে আনীত সংশোধনীগুলো থেকে দেখা যায়,কোটাকে একটা জটিল বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে।[৭৭]

গত ২১, ২২ ও ২৫তম বিসিএস এ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত কোটার যথাক্রমে ১০.৮, ২.২ ও ৫.২ ভাগ পূর্ণ হয়। মুক্তিযোদ্ধা, নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা ও পেশাগত ক্যাডারে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ২৮তম বিসিএসে ৮১০টি এবং ২৯তম বিসিএসে ৭৯২টি পদ খালি ছিল। পরে এসব পদে নিয়োগ দিতে ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস হয়। ৩২তম বিসিএসের মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূরণ না হওয়া এক হাজার ১২৫টি পদ ৩৩তম বিসিএসের মেধা তালিকা থেকে পূরণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সরকার। এ কারণে ৩৩তম বিসিএসে মেধা কোটায় নিয়োগ ৭৭.৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ৩৫তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা, নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় পূরণ না হওয়া ৩৩৮টি পদ ৩৬তম বিসিএসের মেধাতালিকা থেকে পূরণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিল মন্ত্রিসভা। একই সঙ্গে ৩৬তম বিসিএসে কোটার ৭৩৭টি পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণের বিধান শিথিল করা হয়েছিল। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কারণে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় মেধা কোটায় ৭০.৩৮ ভাগ নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।পিএসসি সরকারকে সতর্ক করে বলেছিল, ৩৬তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৪৯১টি, নারী কোটায় ১৬৪টি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় ৮২টি পদ খালি থাকবে।পিএসসির আবেদনে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিসভা কোটার পদ সংরক্ষণ না করে জাতীয় মেধা তালিকা থেকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যই মূলত শূন্য পদ মেধাবীদের দিয়ে পূরণের সুপারিশ আসে।[৭৮] এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে কোটা পদ্ধতি সংস্কার করার দাবি উঠে। ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি তুলে দিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পরিপত্র জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়৪ অক্টোবর ২০১৮।[৩]

[৩]এ পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'সরকার সকল সরকারি দফতর, স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়েগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৩/১৯৯৭ তারিখের সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নং স্মারকে উল্লিখিত কোটা পদ্ধতি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করিল: (ক) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার

বিসিএস নিয়োগে মেধা কোটা ৪৫ শতাংশ হলেও বাস্তবে গড় নিয়োগ ৭০ শতাংশের বেশি। তাই সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। তবে কারও কারও মতে কোটা একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। সময়ের প্রয়োজনে বন্টন ও প্রয়োগ সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার হওয়া দরকার ছিল,[৭৯] কারণ কোটা একেবারে বিলুপ্ত করে দিলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা কঠিন হবে। তাই কোটা পুরোপুরি বাতিল না করে বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এটি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনাই ন্যায়সঙ্গত।[৮০]

প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রচলন রয়েছে।গত ছয়বছরে অবসরের পর সরকারি কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, ক্যাডার, নন-ক্যাডার নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আওতাভুক্ত। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কোনো নীতিমালা নেই। প্রশাসনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে শুধু যোগ্যতাই নয়, ক্ষমতাসীনদের 'নিজের লোক' বিবেচনায় এরা নিয়োগ পান। সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়া এই নিয়োগের অলিখিত প্রধান যোগ্যতা। চুক্তিতে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তারা বছরের পর বছর স্বপদে বহাল থাকতে চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে তদবির করে।[৮১]

সারণি৯: চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ (২০১২-২০১৭)

সাল	সংখ্যা
২০১২	৫
২০১৩	৩১
২০১৪	৪০
২০১৫	৪৫
২০১৬	৪০
২০১৭	৫১

তথ্যসূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া, জানুয়ারি ২০১৯।

নিয়মিত যোগ্য কর্মকর্তা থাকার পরও চুক্তিতে নিয়োগ দিলে সরকারের আর্থিক খরচ বৃদ্ধি হয়। নীতিমালা না থাকায় জনপ্রশাসনে প্রেষণে নিয়োগ হচ্ছে সামরিক কর্মকর্তাও, যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে জনপ্রশাসনের নিয়মিত কর্মকর্তাদের। চলমান চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিরোধিতা করে ২০১৪ সালের ১ মার্চ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের কাছে একটি চিঠিতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রণীত হয়নি।[৮২]সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, প্রশাসনের বিশেষায়িত ও কারিগরি পদে যেখানে দক্ষ লোকের সংখ্যা খুবই কম সেখানে শুধু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে এখন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। চাকরির মেয়াদ শেষে সাধারণত সরকারের আস্থাভাজন কর্মকর্তারাই তদবির করে চুক্তিতে নিয়োগ পান। এতে নিয়মিতদের মধ্যে যোগ্য অনেক কর্মকর্তাই পদোন্নতি পাচ্ছেন না। সচিব পদে বেশ কয়েকজনকে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়ায় দক্ষ ও যোগ্য অতিরিক্ত সচিবরা সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাচ্ছেন না। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে যারা পরবর্তী সময়ে ওইসব পদে যাওয়ার যোগ্য তারা হতাশ হন। তাদের পদোন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ, হতাশা সৃষ্টি হয়। এতে প্রশাসনিক কাজের গতি ব্যাহত হয়।[৮৩]

নিয়োগে জেন্ডার ভারসাম্য

জনপ্রশাসনে বর্তমানে মোট কর্মরত প্রথম শ্রেণির ১,৫৪,৬৮১[৪]কর্মকর্তার মধ্যে ৮০ শতাংশ (১,২৪,৬৩৯) পুরুষ ও ২০ শতাংশ (৩০,০৪২) নারী।

ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে; এবং (খ) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হইল।' কাটা বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলনের ফলে এই পরিপত্র জারি করা হলো।'

[৪]সরকারের সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর (Department & Directorate), বিভাগীয় কমিশার/জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী ও ভূমি অফিসের কার্যালয়, সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন মিলে মোট কর্মকর্তার সংখ্যা।

সারণি ১০: লিঙ্গভেদে জনপ্রশাসনে কর্মকর্তা বিভাজন

	পুরুষ	নারী	মোট
১ম শ্রেণি	১,২৪,৬৩৯ (৮০%)	৩০,০৪২(২০%)	১,৫৪,৬৮১
২য় শ্রেণি	৭৭,৩১৫(৬৬%)	৪০,৫৬৩(৩৪%)	১,১৭,৮৭৮
৩য় শ্রেণি	৫,৮৫,১২৭(৭০%)	২,৪৮,৭৮০(৩০%)	৮,৩৩,৯০৭
৪র্থ শ্রেণি	২,০৬,৩৯৮(৮১%)	৪৯,৪৩৪(১৯%)	২,৫৫,৮৩২
মোট	**৯,৯৩,৪৭৯(৭২%)**	**৩,৬৮,৮১৯(২৮%)**	**১৩,৬২,২৯৮**

তথ্যসূত্র: Statistics of Civil andStaff 2017, Ministry of Public Administration

বর্তমানে সরকারের সকলমন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, বিভাগীয় কমিশার/জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী ও ভূমি অফিসের কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকতাদের মধ্যে লিঙ্গভেদে বিভাজন নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে (চিত্র ১)। চিত্রে দেখা যায়, সরকারি অধিদপ্তরগুলিতে সবচেয়ে বেশি প্রথম শ্রেণির নারী কর্মকর্তা রয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অর্থাৎ সচিবালয়কেন্দ্রিক জনপ্রশাসনের উচ্চস্তরে নারী কর্মকর্তা ৭১০ জন। মাঠ প্রশাসনের বিভাগীয় কমিশনার/ জেলাপ্রশাসক/উপজেলা প্রশাসন ও ভূমি অফিসের কার্যালয়ে নারী কর্মকর্তা ৫৩৬ জন। দেশে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা আছেন ৫ হাজার ৬৯৮ জন। এর মধ্যে ১ হাজার ২৭৭ জন নারীা।[৮৪]

কেন্দ্রীয় প্রশাসন: স্বাধীনতার পর প্রশাসন ক্যাডারে প্রথম নারীরা নিয়োগ পান ১৯৮২ সালে। জনপ্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ সচিবের দায়িত্বে একজন নারীকে দেখতে দেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। ৬ মার্চ ২০১৮ অনুযায়ী, সচিব ও সমপর্যায়ের ৭৭টি পদে ১০ জন নারী রয়েছেন যা মোট সচিবের ১৩ শতাংশ। প্রশাসনে বর্তমানে ৫৩৩ অতিরিক্ত সচিবের৭৮ জন নারী (১৫%), ৯৭ যুগ্ম সচিব, ২০২ উপসচিব, ৩৬০ সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ৪৩৫ সহকারী সচিব নারী।[৮৫]

চিত্র ১: জনপ্রশাসনে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নারী-পুরুষ ভেদে বিভাজন

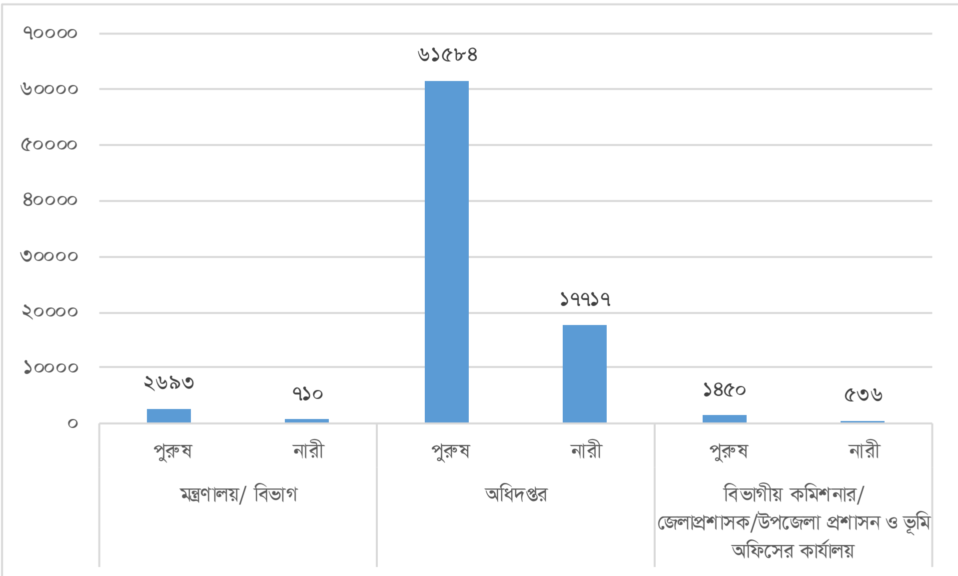

মাঠ প্রশাসন: মাঠ প্রশাসনের অংশ হিসেবে একজন বিভাগীয় কমিশনার, ৬ জন ডিসি, ২০ জন এডিসি, ১১৩ জন ইউএনও (২৫%), ১০৮ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নারী।

২০১০ সালে সরকারি চাকরিতে নারী ছিলেন ২ লাখ ২৭ হাজার ১১৪ জন। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার ২০৬ জন। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে সরকারি চাকরিতে নারীকর্মীর সংখ্যা বেড়েছে এক লাখ ৩৫ হাজার ৯২ জন। সার্বিকভাবে সরকারি চাকরিতে নারীদের যোগদান বাড়ছে।

পদায়নের জন্য তদবির

প্রশাসনে যে পরিমাণ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে তাদের পদায়নের জন্য উপযুক্ত পদ নেই। ফলে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা পদায়নের জন্য তদবিরে লিপ্ত হন। বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে তাদের পছন্দের স্থানে পদায়নের জন্য তদবির করা

একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে পদায়ন পেতে কিছু শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং কোনো কোনো শিক্ষক সরকারদলীয় সাংসদ পর্যায় পর্যন্ত তদবির শুরু করেন। প্রভাবশালী মহলের চাপ সামাল দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশি শিক্ষকদের 'ওএসডি' হিসেবে পদায়ন করে রাজধানী ও আশেপাশের বিভিন্ন কলেজে সংযুক্ত করে রাখে। ঢাকায় অতিরিক্ত শিক্ষকদের বিনা কাজে বেতন নেওয়া প্রশাসনিক ও পেশাগত শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যত্যয় ও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়।[৮৬]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রীর দপ্তরের ক্ষমতাধর কর্মকর্তার পছন্দের ব্যক্তিরা বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে পদায়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সাবেক ছাত্রনেতা/পছন্দের ব্যক্তিবিদেশে পদায়ন পাচ্ছেন। পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তারা দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে তাঁরা বিদেশে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার কথা কিন্তু রাজনৈতিক ও মহলবিশেষের পছন্দ-বিবেচনায় এমন ব্যক্তিরা (ক্যাডার বহির্ভূত) বিদেশে পদায়ন পাচ্ছেন যাঁদের কূটনীতি সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই।[৮৭]লোভনীয় জায়গায় পদায়ন পেতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মন্ত্রী ও সচিবের দফতরে তদবির করেন। তদবির সংস্কৃতি এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে,২১ জুলাই ২০১৫ তদবির সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার পরিপন্থী উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। পরিপত্রে বলা হয়েছে, তদবির বন্ধ না করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[৮৮]সরকারি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতে না চাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাই সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পরই পছন্দের জায়গায় পদায়নের জন্য শুরু হয় তদবির। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই তারা তদবির করেন রাজধানীতে অথবা জেলা সদরে থাকার। চিকিৎসকদের এলাকায় না থাকার বিষয়ে অতীতে বহুবার সংসদ সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।[৮৯]

৩.৬ কৌশল-৬: "পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়নের উদ্যোগ: রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান এবং বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৬ বছর আগে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের কথা উল্লেখ আছে। দীর্ঘ সময় ধরে সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়নের বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[৯০]

- ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সরকারি কর্মচারী আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এটি চূড়ান্ত করতে ২০১৩ সালের ১৪ জানুয়ারি একটি কমিটি গঠিত হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করে ২০১৪ সালের ২১ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বহুল কাঙ্ক্ষিত ওই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে।
- আইনটির প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়ার ছয় বছর পর ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই প্রস্তাবিত আইনটি মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন পায়।
- ২০১৫ সালে মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার পর বৈঠকের সারসংক্ষেপে প্রস্তাবিত এই আইনের কিছু বিষয় সংযোজন-বিয়োজন করে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ে যাওয়ার পর দুদকের প্রাধান্য বজায় রাখতে কোনো কর্মচারীর দুর্নীতির ক্ষেত্রে গ্রেফতার করতে গেলে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করা হয়।
- ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর সরকারি কর্মচারী আইনের খসড়া পুনরায় মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হলে এটি চূড়ান্ত অনুমোদন না দিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্দেশ দেয় মন্ত্রিসভা। এরপর থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আইনটির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেছে একাধিকবার।
- ২০১৭ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়। পরে প্রস্তাবিত আইনটির কয়েকটি ধারা বিশ্লেষণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনকে প্রধান করে আট সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করে সরকার। ওই কমিটি প্রতিবেদন জমা দিলে সচিব কমিটির সভায় তা অনুমোদন দেওয়া হয়।
- ২০ আগস্ট ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে 'সরকারি কর্মচারী আইন' খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এই আইনের শিরোনাম আগে 'সরকারি কর্মচারী আইন' থাকলেও এখন তা নাম বদলে হয়েছে 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'।[৯১] আইনটি ১৪ নভেম্বর২০১৮ সালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

আইনে সংযুক্ত বিষয়াবলী

এ আইনে ৬২টি ধারা সংবলিত ১৩টি অধ্যায় আছে। এ আইনে সরকারি কর্মচারীগণের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের[৬২] কথা বলা হয়েছে; সরাসরি জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে হইবে মেধা ও উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার বিধান রাখা হয়েছে।[৬৩]মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।[৬৪]কোনো সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বা এক বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড দন্ডিত হলে,দণ্ড আরোপের আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে চাকরি হতে তাতক্ষনিকভাবে বরখাস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৬৫]কোনো সরকারি কর্মচারীকে ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার করতে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে।[৬৬]আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দন্ডিত ও চাকরি হতে বরখাস্তকৃত কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন, এবং অনুরূপ আদেশের ফলে উক্ত কর্মচারী চাকরিতে পুনর্বহাল হতে পারবেন বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে।[৬৭]

চর্চা

আইনটি সম্প্রতি পাশ হয়েছে মাত্র, এখনো চর্চা পর্যালোচনার সময় আসেনি।

৩.৭ কৌশল-৭: "কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান-সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এ সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আইনের ১৮ ধারায় উল্লেখ আছে- "সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য অর্জন এবং সুষ্ঠু জনবল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন কর্ম বা কর্ম বিভাগের উপযোগী করিয়া কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।"[৬৮]

চর্চা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান-সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যেগে কিছু সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা হয়েছে। 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' এর একটি খসড়া প্রণীত হয়েছে। এ খসড়ায় চাকরিতে প্রবেশকাল হতে অবসরকাল পর্যন্ত একজন সরকারি কর্মকর্তা সকল ধরনের কার্যপ্রণালী যেমন, পদায়ন, প্রশিক্ষণ (কতসময় পর পর কিকি বিষয়ে কি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে), পদোন্নতি, প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয় একটি কাঠামো/সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসা। প্রণীত খসড়াটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান। যেহেতু এটি একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, তাই ইতোমধ্যে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন চূড়ান্ত হওয়া সমীচীন ছিল যা বাস্তবে হয়নি।

৩.৮ কৌশল-৮: "কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ১৭ বিধিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে "সরকারি কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন কর্ম বা কর্মবিভাগের উপযোগী করিয়া প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।" জনপ্রশাসনে প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর জন্য বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩ প্রণীত হয়েছে।নীতিমালায় উল্লেখ আছে প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা নেতিবাচক দিক হিসাবে পদোন্নতিতে বিবেচিত হবে।শিক্ষানবিসকাল দুই বছরের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও ডিপার্টমেন্টাল কোর্স (Departmental Course) সম্পন্ন করার বাধ্যবাদকতা রয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর এক বছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়নের বিষয়ে নীতিমালায় উল্লেখ আছে।

চর্চা

আধুনিক ভারতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) প্রথমবারের মতো ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেন। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত বেসামরিক আমলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের শেষ অবধি অক্ষুন্ন ছিল এবং ক্রমশ পাকিস্তান আমল, এমনকি বাংলাদেশেও অব্যাহত রয়েছে। নতুন কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষ ও জনমুখী করেগড়ে তোলার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মেয়াদে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি দুটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়: প্রধান/মূল কোর্স এবং সংক্ষিপ্তকোর্স। মূল কোর্সগুলি সাধারণত ১০ থেকে ১৬ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নের সাথে যুক্ত থাকে তবে সংক্ষিপ্ত কোর্স সাধারণত ১ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে থাকে।

প্রধান/মৌলিক কোর্স: প্রধান কোর্সগুলি হচ্ছে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ(এফটিসি), প্রশাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সিনিয়র স্টাফ প্রশিক্ষণ (এসএসসি), এবং নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (পিপিএমসি)।[৯৯]

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (এফটিসি):মধ্যম পর্যায়ে পদোন্নতির পূর্বশর্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সপ্রথম শ্রেণির সকল কর্মকর্তার জন্য অত্যাবশ্যক। সাধারণত বিসিএস শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন প্রভৃতি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগের পর জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দান করা হয়।ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য সর্বপ্রথম প্রশিক্ষণ হলো বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। নিয়োগের পর পর্যায়ক্রমে এসব কর্মকর্তাকে এ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

প্রশাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক উচচতর প্রশিক্ষণ (এসিএডি): প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চতরপ্রশিক্ষণ কোর্সটি উপসচিব ও সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। বুনিয়াদি কোর্সের মতোই এ কোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত মাসাধিককালব্যাপী পরিচালিত আবাসিক কোর্স। আড়াই মাসের এ পাঠক্রম তিনটি মডিউল বিন্যস্ত, যেমনলোকপ্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ইংরেজি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারিত ভাষণসহ বিবিধ বিষয়।

সিনিয়র স্টাফ প্রশিক্ষণ (এসএসসি): সিনিয়র স্টাফ কোর্সটি যুগ্মসচিব এবং সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য। একটি নীতি নির্ধারনী স্তরের কোর্স। সরকারের যুগ্ম সচিব এবং তাদের সমতুল্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জন্য পরিকল্পিত এবং সংগঠিত একটি প্রশিক্ষণ। এই কোর্সটি উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যাতে তাঁরা বাংলাদেশের জটিল এবং গতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়নে এবং তার কার্যকারিতায় ভূমিকা রাখতে পারে।

নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (পিপিএমসি): নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণটি (পিপিএমসি) সরকারকে অতিরিক্ত সচিবদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে তারা জনসাধারণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলি হলো-প্রকল্প ব্যবস্থাপনা; ই-গভার্নেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, কৌশল ও দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা; বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বিষয়ক কোর্স; স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশিক্ষণ - জলবায়ু অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইত্যাদি।[১০০]এছাড়া দুটো বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে, যেমন-বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ যা ৪০ উর্ধ্ব ৯ম গ্রেডের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। আর একটি হচ্ছে, নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ বিষয়ে জরুরী এবং সাম্প্রতিক বিষয়ে সরকারের সচিবদের জন্য লাঞ্চ টাইম/ডিনার টাইম প্রশিক্ষণ। এছাড়াও প্রশাসন ক্যাডারের জন্য বর্তমানে প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির আইন ও প্রশাসন কোর্স। এ কোর্সের মেয়াদকাল চার মাস। এর পরে রয়েছে 'সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট' কোর্স। এর মেয়াদকাল দুই মাস। আর পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত একটি প্রশিক্ষণ যা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি কোর্স নামে পরিচিত। এ কোর্সের মেয়াদ মাত্র ২৮ দিন। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে ৫০ কর্মকর্তার বিদেশে এমএস করার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি আরও ২০ কর্মকর্তা বিদেশে ডিপ্লোমা করতে পারেন।২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত বিদেশে মাস্টার্স করেছেন ৫৭৭ জন, ডিপ্লোমা ১৫৭ ও সংক্ষিপ্ত কোর্স ১৭১৭ জন এবং দশ বছরে ব্যয় ৩০৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা।সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে শুদ্ধাচার বিষয় মাত্র দুটি প্রশিক্ষণ রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কোর্স ও গভার্নেন্স ইনোভেশন কোস।[১০১]দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কোর্সে ৩৬৮ জন ও গভার্নেন্স ইনোভেশন কোর্সে ১২০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়: কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বিষয়াবলী যেমন-আইন, প্রশাসন, সেটেলমেন্ট, পাবলিক পলিসি, সুশাসন, জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার ধরন:সাভারের বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার ও অন্যান্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা) তিন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যেমন- প্রাথমিক পর্যায়ের আমলাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (সহকারী সচিব); মধ্যম পর্যায়ের আমলাদের (উপসচিব পর্যায়) প্রশাসন ও উন্নয়নে উচ্চতরপ্রশিক্ষণ; উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমলাদের (যুগ্মসচিব পর্যায়) উচ্চতর প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

১৯৭১ সালের পর নতুন প্রশাসনিক চাহিদার প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যক সরকারি আমলা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী রূপান্তরিত হয় সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমীতে। ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় গণপ্রশাসন প্রতিষ্ঠান এর বহুবিধ কার্যক্রম নিয়ে অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭৭ সালে প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী, জাতীয় গণপ্রশাসন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক স্টাফ কলেজকে একত্রিত করে ঢাকার সাভারে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সদর দপ্তরে চারটি আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। এ কেন্দ্রগুলোর দায়িত্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাসহ সহায়ক কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা, মাঝেমধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা, প্রতিবছর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর জন্য বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে তা প্রেরণ করা।

সাভারের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তিন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ের আমলাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (সহকারী সচিব); মধ্যম পর্যায়ের আমলাদের (উপসচিব পর্যায়) প্রশাসন ও উন্নয়নে উচ্চতর প্রশিক্ষণ; উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমলাদের (যুগ্মসচিব পর্যায়) উচ্চতর প্রশিক্ষণ। অফিসার ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের জন্যও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কার্যত অফিসার বা আমলাদের প্রশিক্ষণের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মোট ৩২৫টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে ২৫টি প্রধান প্রতিষ্ঠান[৫] হিসেবে চিহ্নিত।[১০২]

৩.৯ কৌশল-৯: "জ্যেষ্ঠতা,কৃতি,জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর চতুর্থ অধ্যায়ে পদোন্নতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ আইনের ধারা ৮(১) এ উল্লেখ আছে, "কোন স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে"। আরো উল্লেখ আছে, "এই আইন ও আপাতত বলবত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে পদোন্নতি প্রদান সম্পর্কিত বিষয় ও শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।" উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতির জন্য 'উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২' রয়েছে। ক্যাডার পদে পদোন্নতির জন্য এ বিষয়ক কিছু নির্দেশনা আছে। পরিপূর্ণ কোন বিধি বা নীতি নেই। নির্দেশনায় যোগ্যতা যেমন বিভাগীয় পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, সিনিয়র স্কেল পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হবার বাধ্যবাধকতা, চাকরিতে স্থায়ী হওয়া, চাকরি সন্তোষজনক হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া কেবল শূন্য পদের বিপরীতে পদোন্নতি প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

চর্চা

প্রশাসনে পদোন্নতি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। নির্দিষ্ট সময়ান্তে যোগ্যতা ও দক্ষতার মাপকাঠিতে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু সবসময় নিয়ম রক্ষা করে পদোন্নতি দেওয়া হয় না। পদোন্নতিতে সময় যোগ্যতা, দক্ষতার বাইরেও নানাবিধ বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়।[১০৩]জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি প্রক্রিয়ার চর্চা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার নিয়ম থাকলেও উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি পরীক্ষা নেই। ফলে পদোন্নতি

[৫] এগুলো হলো পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসপ্রশাসন একাডেমী, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, বাংলাদেশ শুল্ক আবগারী ও মূসক প্রশিক্ষণ একাডেমী, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিদপ্তর, আর্থিক ব্যবস্থাপনা একাডেমী, খাদ্য দপ্তর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্র বিষয়ক একাডেমী, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পশুসম্পদ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, জাতীয় গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী, পুলিশ একাডেমী, পোস্টাল একাডেমী, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ।

প্রক্রিয়ায় মেধা, যোগ্যতা, প্রতিযোগিতা উপেক্ষিত।পদোন্নতি বিধিমালার নির্ধারিত নম্বর ছাড়াও যুগ্ম সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ে 'সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত' বিবেচিত হতে হবে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের কাছে। এ বিধানটি যৌক্তিক হলেও অনেকক্ষেত্রে এর অপব্যবহার হচ্ছে।

প্রায় সকল মুখ্য তথ্যদাতা মনে করেন, প্রশাসনের তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি প্রদানে বিশৃঙ্খলা শুরু হয় নব্বই পরবর্তী সময় হতে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় যেবিশৃঙ্খলা শুরু হয় তা বর্তমান সময় পর্যন্ত কিভাবে ধীরে ধীরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হলো-

- ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জয়লাভকারী সরকার গঠন করার এক বছর পার না হতেই প্রয়োজনীয় শূন্য পদ না থাকা সত্ত্বেও ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদগুলোয় সাতশ'র বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়। এর আগে এত বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তাকে একসঙ্গে পদোন্নতি দেওয়ার নজির ছিল না। পদায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শূন্যপদ না থাকায় এসব পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, বিশেষ করে উপসচিব ও যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের অধিকাংশকে কমবেশি এক বছর পর্যন্ত ওএসডি হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) রাখা হয়।[১০৪]
- ১৯৯২ সালের পর প্রশাসনে মামলা-মোকদ্দমার জেরে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পদোন্নতি কার্যত বন্ধই ছিল। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সরকার মামলা-মোকদ্দমার পরিবর্তে কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে পদোন্নতির দ্বার খুলে দেয়। ১৯৯২ সালে বিএনপি প্রয়োজনীয় শূন্যপদ ছাড়াই বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে যে নজির সৃষ্টি করে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তা অনুসরণ করে।[১০৫]
- ২০০২ সালে পদোন্নতির প্রক্রিয়ায় বেশিমাত্রায় নতুন উপসর্গ যোগ হয়। 'তথ্যের প্রয়োজন' না হয় 'জনতার মঞ্চের কর্মকর্তা' ইত্যাদি বিশেষণ লাগিয়ে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত রাখার প্রবণতাশুরু হয়। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের একেবারে শেষ সময়ে কোন শূন্য পদ ব্যতিরেকে প্রায় ৪০০ কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে সরকার পরিবর্তনের পর উপসচিবের প্রায় ৩০০ সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে তখনকার মতো পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।[১০৬]
- একই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের 'সরকারবিরোধী' শিবিরে (বিএনপি-জামাত সমর্থিত) চিহ্নিত করে পদোন্নতি বঞ্চিত রাখার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ফলে পদোন্নতির দাবিদার কর্মকর্তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর জনপ্রশাসনের পদোন্নতিতে বেশ অনিয়ম বা রাজনৈতিক বিবেচনা কিংবা পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- জোট সরকারের প্রথম দুই বছরে যে ১২ দফায় এক হাজার ২৭৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিতে গিয়ে ৮৫১ জনকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়।[১০৭]

শূন্যপদ না থাকা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা পদোন্নতি দেওয়ার মাধ্যমে বড় ধরনের পদায়ন সংকট সৃষ্টি হয়। জনপ্রশাসনে উর্ধ্বতন পদসমূহে (উপসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে অধিক পদোন্নতির কারণে কোন কোন পদের বিপরীতে প্রায় দ্বিগুণ-সংখ্যক কর্মকর্তা রয়েছে।[১০৮]বর্তমানে পদের বিপরীতে কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক কর্মকর্তাকে আগের পদেই পদায়ন (ইন সি টু) করা হয়েছিল। একটি পদের বিপরীতে তৈরি হচ্ছে অনেক পদ। এতে পদোন্নতি প্রাপ্তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা বাড়লেও নতুন পদে কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। আর কাজ না পেয়ে ক্ষোভ বাড়ছে।[১০৯]

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-ওএসডি

ওএসডি হচ্ছে'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি'। সরকারি তথ্যমতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে, উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদানের পর, দেশে-বিদেশে শিক্ষা/লিয়েন/প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া, পি.আর.এল. গমনের পূর্বে বেতনভাতা প্রদানের সুবিধার্থে স্বল্প সময়ের জন্য, বিভাগীয় মামলা/দুর্নীতি মামলা রুজু হওয়ার প্রেক্ষিতে, তিনমাসের বেশি ছুটির ক্ষেত্রে, এবং সরকারের বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় সক্ষম কর্মকর্তাকে সংযুক্তির মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকেও কোনো কর্মকর্তাকে ওএসডি করা করা হতো এসবকারণে। কিন্তু গত ২৬ বছরে কর্মকর্তাদের নিয়মিত পদের বাইরে বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদানের শূন্য পদের অভাবে এবং ক্ষমতাসীন দলের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নয়, এমন কর্মকর্তাদেরওএসডি করা হচ্ছে।[১১০]

পদসংখ্যার অধিক পদোন্নতি দিয়ে পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতেও কিছুদিন ওএসডি রাখার আবশ্যকতা থাকতে পারে। তেমনি আবশ্যকতা থাকতে পারে গুরুতর অভিযোগ তদন্তাধীন সময়কালে কাউকে ওএসডি রাখা। কিন্তু ওএসডি করা হচ্ছে সরকারের সুনজরে নেই এমন অনেক কর্মকর্তাদের। এই সংস্কৃতিটি দীর্ঘকালের তবে বিগত দুই দশকে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে এর হার ও সময়কাল। রাজনৈতিক কারণেই বেশি ওএসডি। বিএনপি সরকারের সময়ে থাকা ওএসডিরা আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে এবং আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে থাকা ওএসডিরা বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান। তবে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণেও কোনো কোনো কর্মকর্তাকে ওএসডি করার অভিযোগ

আছে।[১১১]ওএসডি হওয়া কর্মকর্তার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ে-কমে। এ কারণে এ হিসাবের হেরফের হতে পারে। কেন ওএসডি করা হলো, এর কারণ জানানো হয় না।

সারণি ১১: সরকারি তথ্যমতে ওএসডি কর্মকর্তার সংখ্যা (২৪ জুলাই ২০১৮)

পদ	ওএসডি (সংখ্যা)
সচিব	১
অতিরিক্ত সচিব	১২
যুগ্ম সচিব	৩৪
উপসচিব	৬০
অন্যান্য	৫২
মোট	১৫৯

উৎস: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২০১৮।

প্রশাসনে বড় পদোন্নতির প্রক্রিয়ায় সবার জন্য পদ জোগাড় করা যাচ্ছে না। তাই অনেককে ন্যস্ত, ওএসডি দিয়ে পদোন্নতিপূর্ব মন্ত্রণালয়ে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) অধস্তন পদে রাখা হচ্ছে। ওএসডি কর্মকর্তারা পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে কাজ না করেও সরকারি সব আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ন্যস্ত কর্মকর্তাদের। ন্যস্ত কর্মকর্তারা না পাবেন বসার জায়গা, না পাবেন কোনো ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা। অবশ্য যখন পদ-পদবি পাবেন তখন বকেয়া হিসাবে সব সুবিধা পাবেন।[১১২]

পদোন্নতি বঞ্চনা

বিসিএস ১০, ১৩, ১৫ ও ১৮তম ব্যাচের সিনিয়র সহকারী সচিবদের উপেক্ষা করে ২০০১ সালে বিসিএস ২২তম ব্যাচের বেশির ভাগ কর্মকর্তার উপসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ১৮তম ব্যাচের কয়েকজন সিনিয়র সহকারী সচিব চারবারেও পদোন্নতি পাননি। ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ থেকে চার ধাপে পদোন্নতি দিলেও বর্তমানে ১৮তম ব্যাচে পদোন্নতিবঞ্চিত হয়েছেন সাতজন। যোগ্যতা থাকলেও পদোন্নতি বঞ্চিত হয়েছেন এসব কর্মকর্তারা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া হয় বলে অভিযোগ প্রকট।[১১৩]পদোন্নতি বিধিমালার নির্ধারিত নম্বর ছাড়াও যুগ্ম সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ে 'সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত' বিবেচিত হতে হবে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড এর কাছে। এ বিধানটি যৌক্তিক হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর অপব্যবহার হচ্ছে। অধিক যোগ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে। কেউ কেউ অতিক্রান্ত হয়েছেন চার-পাঁচবারও। গত দেড় দশকে বিষয়টি ব্যপক থেকে ব্যপকতর হয়েছে। পদোন্নতিবঞ্চিত, ওএসডি কর্মকর্তারা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।[১১৪] কোন এক ব্যাচের সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হওয়া কর্মকর্তা সাত বছর ধরে ওএসডি হয়ে ছিলেন।[১১৫]

পদোন্নতিতে গোয়েন্দা রিপোর্টের প্রভাব

জনপ্রশাসনে এক সময় পদোন্নতি হতো জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। বিভাগীয় মামলা, দুদকের মামলা বা এ ধরনের গুরুতর কোন সমস্যা না থাকলে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী সবাই পদোন্নতি পেতেন। বর্তমানে প্রশাসনে পদোন্নতি ও এরপর পদায়নে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' একটি বড় আতংক হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন গোয়েন্দা সংস্থা কি বিষয়ে কখন কি রিপোর্ট দিচ্ছেন তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জানার সুযোগ নেই। রিপোর্টের উপর কর্মকর্তাদের বক্তব্যনেওয়া হয় না ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোনও সুযোগ থাকে না। আর এ কারণে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট'কে কেন্দ্র করে জনপ্রশাসনে ইতিমধ্যে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।[১১৬]জেলায় ডিসি পদায়নে এই পোয়েন্দা রিপোর্ট একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে সরকারি কর্মকর্তারা কোন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত বা কোন কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের আত্মীয় তাও বিবেচনায় আনা হচ্ছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্য ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করলে প্রশাসনিক কাঠামোতে দুর্বলতা তৈরি হয়। প্রশাসনে ভয় ও শঙ্কা বেড়েছে। একসঙ্গে অনেক কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদানকে বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দল তাদের কৃতিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।[১১৭]

৩.১০ কৌশল-১০: "সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন)আইন,২০০৯ প্রণয়ন করেছে।সরকার ই-গভর্ন্যান্স সহায়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ কে বাস্তবতা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পরিমার্জন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। নীতিমালায় যেসব কৌশল জনপ্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো হলো-

- ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয়সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিধিমোতাবেক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পাশাপাশি সিপিটিইউর ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফাইল, তথ্য আদান-প্রদানে আইসিটি ব্যবহার অনুপ্রাণিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামের আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণের কথা বলা হয়েছে।
- সরকারি পর্যায়ে সৃজনশীল ই-গভর্ন্যান্স ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনুতোষিক ও পুরস্কার প্রবর্তন ব্যবস্থা।
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সব সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আইসিটিনির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।
- ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ই- সেবাগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মান নির্ধারণ, ই-গভর্ন্যান্স অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা।

চর্চা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৬ সালের ৮ মেসরকারি কার্যালয়ে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা চালুর নির্দেশ জারি করে, যেখানে বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৮ সাল। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিরপ্রয়োজন হবে। ই-ফাইল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো তাদের আওতাধীন দপ্তরগুলো এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে। ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, একটি আধুনিক, দক্ষ এবং সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগ প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে উপজেলা পর্যন্ত সব সরকারি দপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ই-ফাইল সফটওয়্যার প্রস্তুত করা, যার মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ১৯ হাজার সরকারি অফিসে নথিপত্রের ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থাপনা চালু করা। ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলার অফিসগুলোতে ই-ফাইল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক,জনবান্ধব জনপ্রশাসন তৈরিতে কালের বিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যপক ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধারার কাজ, পরিবর্তিত হয়েছে জনচাহিদা, বৃদ্ধি পেয়েছে জনপ্রশাসনের কর্মপরিধি। পদ সৃজন, পদ বিলোপ, নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান, বিধিমালা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, বদলি, চাকরির শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ডিজিটাইজেশনের উদ্যেগ জনপ্রশাসনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।ই-গভর্ন্যান্স বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। উন্নত দেশ তো বটেই বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর নানা সমস্যাসহ শাসন ব্যবস্থায় সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের পরিষেবা ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারের দক্ষতা নিরূপণে ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা গেলে প্রান্তিক জনপদের নাগরিকদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দ্রুততর ও সহজ হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে দেশব্যাপী, যার কারিগরি সহায়তায় রয়েছে ইউএনডিপি। এটুআই প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সহায়তায় নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[১১৮]যে কার্যক্রমগুলি জনপ্রশাসনের সাথে বেশি সম্পৃক্ত সেগুলি হলো-

জেলা ই-সেবাকেন্দ্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন যৌথভাবে ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর একযোগে দেশের সকল জেলায় ই-সেবাকেন্দ্র কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জেলা ই-সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা অনলাইনে সেবার জন্য আবেদন করতে পারছে। আবেদনে করা হলে আবেদনকারীকে একটি গ্রহণ রশিদ দেওয়া হচ্ছে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড এখন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯ লাখের বেশি নাগরিক আবেদন অনলাইনে নিস্পত্তি করা হয়েছে। জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে জনগণের হয়রানি বন্ধ হওয়া, সময়, শ্রম বেচে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১১৯]

ই-পর্চা: এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে জমির বিভিন্ন রেকর্ডের (এসএ, সিএস, বিআরএস) নকল/পর্চা/ খতিয়ান/ সার্টিফাইড কপি পাওয়া যাচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ৬৪ জেলার রেকর্ডরুমের সকল রেকর্ড (এসএ, সিএস, বিআরএস খতিয়ান কপি) ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। এ যাবৎ ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার রেকর্ড অনলাইনে এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার রেকর্ড ইউআইএসসি থেকে প্রদান করা হয়েছে।[১২০]

ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (এনইএসএস): বাংলাদেশের সকল অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিস থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহকে ই- সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি এককেন্দ্রীক সমন্বিত ই-সার্ভিস প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে যা ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (নেস) নামে পরিচিত। নেস-এর আওতায় প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের দাপ্তরিক কর্মকান্ড ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিস্পত্তি হবে। যে কেউ যেকোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে নাগরিক, দাপ্তরিক ও নকলের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং এর সর্বশেষ আপডেট জানতে পারবে। বিভিন্ন সভার নোটিশসমূহও ডিজিটাল মাধ্যমে (সিস্টেম ম্যাসেজ, ইমেইল, এস.এম.এস) প্রদান করা হবে। ই-সার্ভিস সিস্টেম এর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ই-ফাইলিং, ই-ফর্ম, ই-যোগাযোগ, ই-সার্ভিস ব্যবস্থাপনা, ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, গর্ভমেন্ট ডিরেক্টরি এ্যাকসেস সার্ভিস, ই-ডিরেক্টরি, ন্যাশনাল ই-সার্ভিস পোর্টাল, সিটিজেন ওয়েব একাউন্ট, ই- নোটিফিকেশন এবং নেস ওয়েব সার্ভিসেস। পর্যায়ক্রমে দেশের ১৬ হাজার সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস সিস্টেম চালু করা হবে যেখানে ৬০ হাজার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এটি ব্যবহার করবেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারশর বেশি সরকারি সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হবে। যশোর জেলার ২৪০টি সরকারি অফিসে পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালু করা হয়। এ প্রক্রিয়ার আওতায় ৬০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর ডিজিটাল যশোর উদ্বোধনকালে পরীক্ষামূলকভাবে ই-সার্ভিস সিস্টেম উদ্বোধন করেন।[১২১]

জাতীয় পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক ও ওয়েবসাইট: দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি দপ্তরের জন্য প্রায় ২৫ হাজার পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। জাতীয় তথ্য বাতায়ন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তথ্য বাতায়ন যা বাংলাদেশের সকল সরকারি অফিসের তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ। সরকারি উদ্যোগে ২৫,০০০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট একসূত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে এর মাধ্যমে। সকল সরকারি ওয়েবসাইটকে একত্রে সংযুক্ত করে প্রতিটি নাগরিকের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই এই জাতীয় বাতায়ন করা হয়েছে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও জনমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষেই এ বাতায়নের যাত্রা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা জেলায় ছোট পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে এটি শুরু হলেও ক্রমেই এর ব্যাপ্তি বিশাল হয়ে এখন ২৫ হাজার সাইটের একটি তথ্যভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।[১২২]

৩.১১ কৌশল-১১: "কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সমন্বয়"

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি

সম্প্রতি প্রণীত সরকারি চাকরি আইন,২০১৮ এর ১৫ ধারায় বেতন,ভাতা, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা আছে। এতে বলা হয়েছে, "সরকার সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, কোনো সরকারি কর্মচারীর বা সকল কর্মচারীর বা সরকারি কর্মচারীগণের কোনো অংশের জন্য বেতন, ভাতা বা বেতনের গ্রেড বা স্কেল, অন্যান্য সুবিধা ও প্রাপ্যতা বা অবসর সুবিধা সম্পর্কিত শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।" এছাড়াসরকারি চাকরিজীবীদের সর্বশেষ অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল,২০১৫ প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। মূল্যস্ফীতির উপর নির্ভর করে ২০১৮ সাল থেকে অষ্টম পে-স্কেল অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সমন্বয় করা হচ্ছে।

চর্চা

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় বেতন কমিশন তাদের সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করেছে। ২০১৫ এর ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে অষ্টম জাতীয় পে-স্কেল অনুমোদন হয়। এর পূর্বে **১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ২০০৪, ২০০৯ ও ২০১৫** সালে আটটি জাতীয় পে-স্কেল গঠিত হয়েছিল।১৯৭২ সালের সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রি-অর্গানেইজেশন কমিটি যা চৌধুরী কমিটি নামে পরিচিত, সরকারি চাকরি কাঠামোর 'ক্লাস' বিলুপ্ত করে গ্রেড প্রথা প্রবর্তন করার জন্য সুপারিশ করেছিল। এ সুপারিশ অনুসারে সর্বমোট ১০টি গ্রেডের প্রবর্তন করা হয়। সর্বোচ্চ গ্রেডে নির্ধারিত বেতন ছিল দুই হাজার টাকা। সর্বনিম্ন দশ গ্রেডের বেতন ছিল

১৩০ টাকা। ১৯৭৬ সালে গঠিত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্বের ১০ গ্রেড ২০ গ্রেডে উন্নীত করা হয়। ওই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চাকরির গ্রেডের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে।[১২৩]

অষ্টম পে-স্কেলের বৈশিষ্ট্য হলো (১) প্রায় চার দশকের পুরনো সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিল, (২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে যোগদান বা পদোন্নতির বিভিন্ন তারিখে নির্ধারিত অঙ্কে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানের প্রথা বাতিল করে প্রতি বছর ১ জুলাই শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি, (৩) চাকরিজীবীদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে বিভাজন বিলুপ্তি এবং গ্রেড অনুযায়ী পরিচিতি, (৪) নববর্ষ ভাতা প্রবর্তন, (৫) পেনশন হার বৃদ্ধি।[১২৪]অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের বেতন শতভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং ২০১৫ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।সরকারি চাকরিজীবীরা নতুন বেতন স্কেলে মূল বেতন পাচ্ছেন ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে। আর ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে ভাতা কার্যকর হয়েছে। এতে প্রতিবছর সরকারি চাকরিজীবীদের ৫ ভাগ হারে ইনক্রিমেন্ট (বেতন বৃদ্ধি) দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির উপর নির্ভর করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন সমন্বয় হচ্ছে ২০১৮ সাল থেকে।[১২৫]প্রাক্তনঅর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭ সালে মার্চ মাসে ঘোষণা দেন, প্রতি বছর মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে সরকারি চাকুরেদের বেতন সমন্বয় করা হবে।[১২৬]

অধ্যায় চার

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

২০১২ সালে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণীত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে এ কৌশল বাস্তবায়নে বেশকিছু পদক্ষেপ যেমন আইনকানুন প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এ কার্যক্রম জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় যথেষ্ঠ নয়। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জবিদ্যমান। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি কেবল জনপ্রশাসনে নয়, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও শুদ্ধাচার চর্চায় ভূমিকা রাখবে।

১. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সম্পদের হিসাব প্রদান তদারকি করার প্রক্রিয়ার ঘাটতি:সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সদ্য প্রণীত সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ তে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা নেই।প্রতি বছর সম্পদের হিসাব প্রদান কার্যক্রমটি যে দীর্ঘদিন চলমান নেই তা তদারকির প্রক্রিয়াও অনুপস্থিত।[১২৭]সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণ প্রদান তাদের অবৈধ সম্পদের মালিক হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার একটা প্রক্রিয়া। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ছাড়াই সরকারি চাকরিজীবীদের অনেকে ঢাকা শহরে বাড়ি, গাড়ি ও ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। তথ্য প্রমাণ এড়াতে তারা এসব সম্পত্তি স্ত্রী, সন্তানের নামে কিনেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে স্ত্রী ও পোষ্যদের নামে ক্রয় করায় নথি দেখে তাদের সরাসরি চিহ্নিত করা দুদক কিংবা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে দুষ্কর।

১৯৭৯ সালে প্রণীত এ আইন কতটা সময়োপযোগী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ আইন প্রণীত হবার পর বিভিন্ন সময় পরিক্রমায় ছয়টি পে-কমিশন গঠিত হয়।[১২৮] সর্বশেষ পে-কমিশনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আয় শতভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যহারে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনে করেন, বিদ্যমান ১৯৭৯ সালের বিধিমালায়ঘোষিত সম্পদের যে ন্যূনতম মূল্য (৫০,০০০ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছিল তা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা আলোচনার বিষয়।

কোনো কোনো আয়কর প্রদানযোগ্য সরকারি কর্মকর্তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তাদের আয়ের আয়কর প্রদানকে সম্পদ বিবরণী প্রদান বলে উল্লেখ করেন। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক আয়ের হিসাব প্রদানের সাথে এ বিধি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা বলেন, এনবিআর-এ আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার সাথে এটি সম্পর্কহীন। এছাড়া এনবিআর-এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের (যাদের আয় কর প্রদানের আওতার মধ্যে) আয়ের হিসাব নেওয়া হয়, সার্বিকভাবে জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (প্রথম শ্রেণি হতে চতুর্থশ্রেণি) এনবিআর তার কার্যক্রমে একীভূত করতে পারে না।এছাড়াও এনবিআরে দাখিল করা তথ্য জানার অধিকারজনপ্রশাসনসহ অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নেই। আয়ের হিসাব প্রদানের জন্য এনবিআর কোন কর্তৃপক্ষ হতে পারে কিনা সেটারও কোনো উল্লেখ এই আচরণ বিধিতে নেই।[১২৯]

২. 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে জ্ঞানের/সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা একটি সহায়ক পরিবেশের অভাব, আস্থার ঘাটতি, বিপদে পড়ার আশংকা,[১৩০]যদিও ৫(৪) ও ৫(৫) ধারায় তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখার বিধান রয়েছে। আইনের ধারা ৫(৬)[৬] অনুযায়ী মামলার শুনানিকালে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত উক্ত মামলার ন্যায়বিচার সম্ভব নয়, তবে আদালত তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে, এই শর্তের ফলে অভিযুক্তদের আইনজীবীর পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করার দাবি আদালতে উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ আছে। ফলে সম্ভাব্য তথ্য প্রকাশকারীর জন্য এটি নেতিবাচক প্রণোদনা সৃষ্টি করছে বলে অনেকে মনে করেন। এসব সীমাবদ্ধতার কারণেও আইনটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি বা এর প্রয়োগ লক্ষণীয় নয়।[১৩১]

[৬]'এই ধারায় অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মামলার শুনানিকালে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রকাশকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তথ্য প্রকাশকারীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত উক্ত মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত সম্ভব নয়, তাহা হইলে আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করিতে এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ধারা ১০ এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে'।

৩. পাবলিক সার্ভিসে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত আচরণ যেমন ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, অবৈধ কার্যকলাপ, বিধি-বহির্ভূত সম্মানী ও ভাতা উত্তোলন, সরকারি বাসার ভাড়া পরিশোধ না করা ইত্যাদি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২,৩১৩টি অভিযোগ দায়ের হয়। বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে এরমধ্যে ২,৩০৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়। এছাড়াও ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত শৃঙ্খলাজনিত কারণে ৪১৫টি বিভাগীয় মামলা দায়ের হয়। এর মধ্য হতে অব্যাহতি পেয়েছেন ১৮৮ জন এবং লঘুদণ্ডদণ্ডপ্রাপ্ত ১১৭ জন ও গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন ৬৩ জন, অনিষ্পত্তিকৃত মামলা ৪৭টি।[১৩২]

অভিযোগ নিরসনে সময়ক্ষেপণ হয় বলে অনেক সরকারি কর্মকর্তাদের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় বিভাগীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও তা অনির্দিষ্টকাল পড়ে থাকছে। উদাহারণস্বরূপ, একটি বিভাগীয় মামলার তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে সাবেক একজন অতিরিক্ত সচিব নির্দোষ। কিন্তু অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি তাকে জানানো হয় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার চার বছর পর। ততদিনে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল বা পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লিভ) চলে গেছেন একটি বিসিএস-এ মেধা তালিকায় প্রথম হওয়া এই কর্মকর্তা।[১৩৩]

মাঠ পর্যায়ের অভিযোগগুলির মধ্যে জেলা প্রশাসক (ডিসি) থেকে শুরু করে ভূমি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহার, হাটবাজার ইজারা, মামলা পরিচালনা, নিয়োগে অনিয়ম উল্লেখযোগ্য। মাঠ পর্যায় থেকে মূলত ইউএনও ও জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় বেশি। সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধা সনদ জালিয়াতির সাথে সচিবদের জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল।শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা শ্রদ্ধাভাজনদের সম্মান জানাতে দেওয়া ক্রেস্ট তৈরিতেও বড় ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ আছে সচিবের বিরুদ্ধে।[১৩৪]

৪. আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি

এসিআর পদ্ধতিতে কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দক্ষ ও অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে তফাত নিরুপণ করা সম্ভব হত না। ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কাজের মান ও পরিমাণের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। ফলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নতুন একটি কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি পিবিইএস প্রচলন করার প্রক্রিয়া হাতে নিলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। যেহেতু এটি একটি শুদ্ধাচার কৌশলের স্বল্পমেয়াদী কৌশল ছিল এবং স্বল্পমেয়াদী কৌশলগুলি সম্পন্নের সময়সীমা ছিল এক বছর, কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা

শুদ্ধাচার পদক ও জনপ্রশাসন পদক: প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা হিসেবে শুদ্ধাচার পদক ও জনপ্রশাসন পদক একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রায় সকল মুখ্যতথ্যদাতা। সরকারি কর্মকর্তারা উৎসাহিত হচ্ছেন, অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মকর্তারা কাজে সৃজনশীলতা আনার চেষ্টা করছে। গবেষণার মুখ্য তথ্যদাতারা মনে করেন, যেহেতু সম্প্রতি এ প্রণোদনা ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে, তাই এ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জগুলি খতিয়ে দেখার জন্য এখনও যথার্থ সময় আসেনি।

উপসচিবদের গাড়ি ক্রয় বাবদ ঋণ সুবিধা: বিভিন্ন প্রণোদনায় শুদ্ধাচার বৃদ্ধির পথে বাস্তব কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বেতন বৃদ্ধির ফলে দুর্নীতি কমেছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহরণ নেই।সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ির সুবিধা বাড়লেও এখনো গাড়ি সুবিধাপ্রাপ্তদের একাংশ পরিবহণ পুল হতে নিয়মিত গাড়ি ব্যবহার করছেন; ফলে সরকারি পুলের ওপর চাপ কমছে না। বিভিন্ন দপ্তরের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তারা সরকারের নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমানভাবে জড়িত থাকলেও গাড়ি ঋণ সুবিধা না পাওয়ায় অন্যান্য ক্যাডারের উপপ্রধান পদে কর্মরতদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন-"আমরা বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা এতো বেশি বৃদ্ধি করে দিয়েছি, তাহলে দুর্নীতি কেন হবে?"

৫. প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

প্রশাসনে অপরিকল্পিত নিয়োগ

জনপ্রশাসনে অপরিকল্পিতভাবে উর্ধ্বতন পদসমূহে অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ সচিব তিন স্তরে নির্ধারিত পদের বিপরীতে এ মুহূর্তে প্রায় দ্বিগুণ কর্মকর্তা কর্মরত। ২ আগস্ট ২০১৮ হিসাবে, বর্তমানে উপসচিবের নিয়মিত (ডিউটি) ১০০৬টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১৭৫৯ জন। যুগ্ম সচিবের ৪১১টি স্থায়ী পদের বিপরীতে আছেন ৭৮০ জন এবং অতিরিক্ত সচিবের ১২১টি স্থায়ী পদের বিপরীতে আছেন ৪৮২ জন।[১৩৫]

নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা

একটি দক্ষ জনপ্রশাসনের মূল কর্তব্য একটি বলিষ্ঠ নিয়োগ নীতি। এ বলিষ্ঠ নিয়োগ নীতিতে প্রথমেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার মেধাকে। চাকরিতে নির্বাচনের ধরণ ও নিয়ম নীতির কারণে বাংলাদেশে মেধার ব্যবহার গুরুত্ব হারিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৬]বাংলাদেশের নিয়োগ নীতিতে কোটা পদ্ধতির প্রাধান্য যা কয়েকটি শ্রেণির প্রার্থীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা এবং জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল[১৩৭]ফলে যোগ্যদের প্রশাসনে আসার প্রবনতা কম ছিল।[১৩৮]

কোটা পদ্ধতিতে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রসঙ্গ। কোটার হার সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের সন্তানসহ মোট জনসংখ্যা যেখানে ১ শতাংশের মতো এর জন্য রাখা হয়েছে ৩০ শতাংশ কোটা। নিয়োগে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত হলে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ জোগাড়ের মাধ্যমে এর অপব্যবহার শুরু হয়েছিল। অসংখ্যবার যাচাই-বাছাই করেও এর হাত থেকে আজও মুক্তি মেলেনি। সংবেদনশীল বিধায় মুক্তিযোদ্ধা কোটার ব্যাপারে সহজে কেউ কোন মন্তব্য করতে চান না। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত অমর্যাদা যদি কিছুতে হয়ে থাকে তা হলো গত কয়েক বছরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ কেলেঙ্কারি এবং তার মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এর ফলে দুর্নীতির নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের তালিকা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৮৩৩। বর্তমান সরকারের প্রথম দিকের একটি তালিকায় ২ লাখ ২ হাজার ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে এই মর্মে আপত্তি দাখিল হয় ৬২ হাজার।[১৩৯]

চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে মেধা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য কম দিয়ে দলীয় ভাবাপন্নদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে সম্প্রতি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। এতে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে এবং তা উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান কাঠামোতে যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়োগ না দিয়ে বাইরের কাউকে নিয়োগদেওয়া হলে তা বিদ্যমান জনবল কাঠামোর জন্য কখনো সুখকর হয় না। এর পরিমাণ অত্যধিক হলে প্রশাসনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক চিঠিতে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি কর্মচারীদের চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার বয়স বাড়ানো হয়েছে। এ কারণে তাঁদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি পরিহার করতে হবে। আগে তাঁরা ৫৭ বছরেই চাকরি থেকে অবসরে যেতেন। ২০১১ সালে সেটা বাড়িয়ে ৫৯ বছর করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মূল শর্ত হল দলীয় মনোভাব, দলীয় আনুগত্য। এটা প্রশাসনের ভারসাম্য নষ্ট করে। দেশে উন্নয়নের যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে তাকে ধরে রাখতে এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে নিতে ক্ষোভ-হতাশামুক্ত একটি দক্ষ ও উদ্যমী প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। গত প্রায় দুই যুগ ধরে প্রশাসনে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি, বিশেষ বিবেচনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। এসব কারণে ধুকছে প্রশাসন।

প্রশাসনিক কাজের ধাপগুলি ক্রমশ বাড়ানো

প্রশাসনিক কাজের ধাপগুলি ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে চারটি ধাপ ছিল- সেকশন অফিসার, ডেপুটি সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও সেক্রেটারি। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ছিল কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে, যেখানে সচিবের কাজ খুব বেশি ছিল। সেই চারটি ধাপ এখন আটটি করা হয়েছে। আগে সেকশন অফিসার প্রথম নোট লিখতেন, এখন সেকশন অ্যাসিসটেন্ট প্রথম নোট লেখেন। অতিরিক্ত সচিব অল্প কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে ছিল আর এখন প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে তিন/চারজন করে অতিরিক্ত সচিব করা হয়েছে এবং নিয়ম করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব হয়ে ফাইল যেতে হবে। সুতরাং এটা আর একটি স্তর যা ৫ম স্তর এবং ৬ষ্ঠ স্তর হলো সচিব। সচিবের পরে, আগে উপমন্ত্রীর কাছে ফাইল যেত না কারণ তারা পার্লামেন্ট সেক্রেটারির কাজ করতেন। তাদের কাজ ছিল পার্লামেন্ট এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখন উপমন্ত্রীর কাছে ফাইল যায়, প্রতিমন্ত্রীর কাছে ফাইল যায়, তারপর মন্ত্রীর কাছে ফাইল যায়। এই আট দফায় যদি ফাইল উপরের দিকে যায় এবং নিচের দিকে নামে এবং এই প্রক্রিয়ায় সবাই যদি সৎ হয়ে তবেও

১৬ কর্মদিবস লেগে যাচ্ছে শুধু ফাইল উঠানামা করতে। এছাড়াও সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। সব ফাইল প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের কাছে চলে যায়। এর ফলে কোন সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব হয় না।[১৪০]

আন্তঃক্যাডার বৈষম্য

নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, কূটনীতিক, প্রশাসক একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়া।[১৪১]প্রশাসন চলবে উলম্বভাবে কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসন চলে সমান্তরাল। স্বরাষ্ট্রসচিবের সমান পদমর্যাদা ভোগ করেন পুলিশের আইজি। পুলিশ প্রধান (আইজি) ও স্বরাষ্ট্রসচিব সমান পদমর্যাদার হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের অধীনস্ত হবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয় । শুধু সচিবালয়ে নয়, মাঠ পর্যায়েও একই অবস্থা। যেমন- জেলা পুলিশ প্রধান কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নির্দেশনাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ডিসি এক কথা বলে তো, এসপি আরেক নির্দেশনা দেয়। উপজেলায় ইউএনওর সমান পদমর্যাদা ভোগ করেন আরো কয়েকটি দপ্তর প্রধান।[১৪২]

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ২৭টি ক্যাডার রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে এসব ক্যাডারের কোনো কোনটি অন্যদের থেকে সুযোগ সুবিধা কম পায়। বিভিন্ন ক্যাডারের পদোন্নতিতেও বৈষম্য রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে নিয়মিত। শুধু প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি হয় প্রায়শই, অন্য ক্যাডাররা এ ধরনের পদোন্নতি পান না। প্রশাসনে অধিক পদোন্নতি দিয়ে সচিবালয় প্রশাসনকে ভারসাম্যহীন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্যাডারের নিজস্ব লাইন পদে পদোন্নতির ভালো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উপসচিব স্তরে আসতে চান না। এর মধ্যে পুলিশ, শুল্ক, কর ইত্যাদি ক্যাডার। গাড়ি কেনায় সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে আর্থিক সহায়তা কেবলমাত্র প্রশাসন ক্যাডারের জন্য ,যা অন্যদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও অমর্যাদাকর বলে মনে করেন অনেক সরকারি কর্মকর্তা।বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে ক্ষোভ রয়েছে।

এছাড়াও বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের একটি বড় সাব-ক্যাডার সাধারণ শিক্ষা। এখানে কমবেশি ৮০টি বিষয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়।পদগুলো বিশেষায়িত বলে কোন সাব-ক্যাডার পদে নিয়মিত পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও বেশকিছুতেই পদ খালি হয়না বলে পদোন্নতি দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় না। ফলে একই ব্যাচে চাকরি পাওয়া শিক্ষকেরা ওপরের স্তরে একই সময়ে পদোন্নতি পাবার সম্ভাবনা কম এবং সময়সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনতে পারলে তা আন্তক্যাডার বৈষম্য কমতে পারে।[১৪৩] এ ছাড়া কিছু কিছু বিশেষায়িত ক্যাডারের শীর্ষ পদের (অধিদপ্তর বা সংস্থা প্রধান) জন্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডারে উপযুক্ত কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হচ্ছে। ফলে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য বেড়েই চলেছে।[১৪৪]সরকারের কর্মকান্ড শুধু একটি প্রশাসন দিয়েই সম্পন্ন হয় না। সরকার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পেছনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং ক্যাডারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কিন্তু জনপ্রশাসনের একটি অঙ্গ অধিকতর সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে বলে অন্যান্য ক্যাডারগুলির অভিযোগ।[১৪৫]

নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগে সময়ক্ষেপণ

সরকারি চাকরি বা বিসিএসের মাধ্যমে চাকরি পেতে প্রস্তুতি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফলের জন্য অপেক্ষা-সব মিলিয়ে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে। একজন চাকরিপ্রত্যাশী যদি এত সময় ব্যয় করার পর দেখে যে তার চাকরি হয়নি, তখন অসন্তোষ খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন পরীক্ষা ছাড়াও প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রয়েছে পুলিশি তদন্ত, গোয়েন্দা তদন্ত এবং আরো কিছু সরকারি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নিয়োগের পূর্বে তদন্ত করা সংস্কৃতি শুরু হয়েছে যা একদিকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কালক্ষেপণ ও অন্যদিকে এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতিকরণের সুযোগ তৈরি করেছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের বাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ১২:বিসিএস এর বিজ্ঞপ্তি হতে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত ব্যয়িত সময়

বিসিএস	ব্যয়িত সময়
৩৬ তম বিসিএস	৩ বছর ১ মাস
৩৫ তম বিসিএস	১ বছর ৬ মাস
৩৪ তম বিসিএস	২ বছর ৬ মাস
৩৩ তম বিসিএস	১ বছর ৮ মাস
৩২ তম বিসিএস	১ বছর ২ মাস
৩১ তম বিসিএস	১ বছর ৫ মাস
৩০ তম বিসিএস	১ বছর ৭ মাস
২৯ তম বিসিএস	২ বছর ১ মাস
২৮ তম বিসিএস	২ বছর ৪ মাস
২৭ তম বিসিএস	৩ বছর ২ মাস

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬।

৩৬তম বিসিএসের পরিপত্র জারি থেকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়ুক্তির জন্য সুপারিশ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ মাস সময় লেগেছে। ৩৬তম বিসিএস আটকে ছিল স্বভাবচরিত্র যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায়। সেখানেও লম্বা সময় নেওয়া হয়েছে। অথচ ঢাকায় ও ঢাকার বাইরের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে ভাগাভাগি করে তিন সপ্তাহে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব। স্বভাবচরিত্র ছাড়াও প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক আনুগত্যসহ অনেক বিষয়ে তল্লাশি হচ্ছে। এছাড়া যত দিন পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষায়িত ক্যাডারের জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা না আসবে, তত দিন তারা জটমুক্ত হতে পারবে না। বিশেষায়িত ক্যাডারগুলোর জন্য পৃথক পরীক্ষা নিলে সময় ও ঝামেলা অনেক কমবে। তারুণদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হচ্ছে এ প্রক্রিয়ায়। নিয়োগ প্রক্রিয়া তেমন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট নয়। সংশ্লিষ্টরা নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে সমস্যাটির মোকাবিলার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। লক্ষ্য থাকা উচিত এ ধরনের পরীক্ষায় এক বছরের মধ্যেই সব কার্যক্রম শেষ করা।[১৪৬]

ডিসি পদায়ন

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৫ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।এটি ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসেবে দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশাসন ক্যাডার থেকে অন্যান্য ক্যাডারে প্রেষণে নিয়োগ

নিয়োগ-পদায়নের একটি বড় নেতিবাচক দিক হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডার হতে প্রেষণে ভিন্ন ক্যাডারে উচ্চপদে নিয়োগ। এ ধরনের নিয়োগে সমস্যাটা প্রকট হয় যখন নিয়োগ করা হয় **বিশেষায়িত**ক্যাডারে (ট্যাকনিক্যাল ক্যাডার)। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিশেষায়িত(টেকনিক্যাল) পদে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন প্রধান আবহাওয়াবিদ, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান-স্পারসো, পরিসংখ্যান, কৃষি, মৎস্য) প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। জনপ্রশাসন হতে পদায়ন করা হচ্ছে এ ধরনের বিশেষায়িতক্যাডারের প্রধান পদে। ফলে বিশেষায়িত ক্যাডারেরকর্মকর্তরা মনে করেন তাদের কর্মক্ষমতা কাজে লাগানো হচ্ছেনা এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এ ধরনের নিয়োগ টেকনিক্যাল সরকারি সংস্থাগুলি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবেতৈরি হবার পথে অন্তরায়।[১৪৭]

নিয়োগে জেন্ডার ভারসাম্য

জনপ্রশাসনে নারীর সুদৃঢ় অবস্থান রূপকল্প ২০২১ অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। প্রশাসনে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতার প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছে। প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্রমান্বয় নীতি নির্ধারণী পর্যায় অবদান রাখার মাধ্যমে প্রশাসনের মূলধারার ক্ষমতায়নে এগিয় চলেছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে এখন এক হাজার ৩৬৮টি প্রকল্প চলমান। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৪৫টি প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) নারী। শতাংশের হিসাবে ৪ শতাংশ। বাকি প্রকল্পগুলোর কর্তারা পুরুষ। এমনকি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১০টিরই পিডি পুরুষ কর্মকর্তা। একজন পুরুষ কর্মকর্তা একসঙ্গে সাতটি প্রকল্পের পিডি। অথচ প্রকল্প পরিচালনা করার মতো অনেক নারী কর্মকর্তা সরকারি চাকরিতে কর্মরত আছেন। শুধু প্রশাসন ক্যাডারেই উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত এখন ৪৮৬ জন নারী কর্মকর্তা আছেন, যাঁরা পিডি হওয়ার যোগ্য। অথচ প্রশাসন ক্যাডারে (চলতি দায়িত্বসহ) পিডির দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র ১৫ জনের মতো নারী।চলতি অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ আছে এক লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে নারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বধানে খরচ হচ্ছে ৯ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি (৬ শতাংশ)। সড়ক ও জনপথ বিভাগে ১৪২টি প্রকল্প যার মধ্যে নারী পিডি মাত্র একজন। বিদ্যুৎ বিভাগে চলমান ১১৩টি প্রকল্পে নারী পিডি দুজন। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১০৫টি প্রকল্পে নারী কর্মকর্তা পিডি আছেন মাত্র তিনজন। নারীর ক্ষমতায়নে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিলেও উন্নয়ন বাজেট খরচের দায়িত্বে নারীরা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছেন। নারী কর্মকর্তারা ৪৫ প্রকল্পে পিডির দায়িত্ব পালন করছেন, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই খুব ছোট। এক হাজার কোটি টাকার নিচে। বড় প্রকল্প আছে মাত্র দুটি। প্রকল্পের পিডি নিয়োগ হয় দুইভাবে। সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ, রেল মন্ত্রণালয়সহ কারিগরিসংক্রান্তপ্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয়ত, কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে যদি পিডি দরকার হয়, তখন ওই মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসনে আবেদন করে। জনপ্রশাসন পিডি নিয়োগ দেয়। বাংলাদেশের জনপ্রশাসন এখনো বড় প্রকল্পে নারীদের পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিচ্ছেনা।[১৪৮]

৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকারি কর্মচারীগণের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ:ধারা ৬(১) অনুযায়ী সরকারের কর্মচারীগণের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হলে এ ধারা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে।

ফৌজদারি মামলায় সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার:ফৌজদারি মামলায় কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আদালতে গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করতে হলে অনুমোদন নেওয়ার বিধান রেখে বহুল আলোচিত আইনের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সব ধরনের ফৌজদারি অপরাধের জন্য ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে গ্রপ্তার করতে হলে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। চার্জশিট হওয়ার পরে গ্রেফতার করার জন্য অনুমতি লাগবে না।
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ (১) ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালনজনিত কারণে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা হলে চার্জশিট দেওয়ার আগে গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার যে বিধান রাখা হয়েছে, তা বৈষম্যমূলক ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থি। দুদকের ক্ষমতা যেমন ক্ষুণ্নহবে, তেমনি সাধারণ নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। ১৯৬৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী দুদক অনুসন্ধান ও তদন্ত পর্যায়ে যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে।[১৪৯]২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৫ ধারায়ও এ বিধান বলবৎ রাখা হয়েছে।[১৫০]সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এ প্রস্তাব রয়েছে, গ্রেপ্তারেরএই বিধান সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ফাঁদ পেতে দুদক যাঁদের গ্রেপ্তার করেছে, তাঁদের বিষয়ে আগে অনুমতি নিতে হলে আসামি ধরা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এ ছাড়া মামলা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁরা বাইরে থাকলে অভিযোগের আলামত নষ্ট, অনুসন্ধানে প্রভাব বিস্তারসহ নানা কর্মকান্ডে যুক্ত হতে পারেন। তাই অনুমতি নিয়ে গ্রেপ্তারের বিধান দুদকের ক্ষমতার রাশ টেনে ধরবে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে একটি বিভাজন তৈরি করা হবে। গ্রেপ্তার করার বিষয়টি অপরাধের ওপর নির্ভর করবে। এটি যদি ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে, তাহলে তা মধ্যযুগীয় বা সামন্তবাদী আইন বলতে হবে।[১৫১]

অবসর প্রদান:চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে সরকার যে কোনো সময় যে কোনো কর্মচারীকে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়া চাকরি থেকে অবসর প্রদান করতে পারবে- এমন বিধান ঝুঁকিপূর্ণ এবং তা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে।

৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান-সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থাকলেও ইতোমধ্যে শুধু ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।এটি জনপ্রশাসন বিষয়ক শুদ্ধাচার কৌশলের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদী বলতে তিন বছর ও দীর্ঘমেয়াদী বলতে পাঁচ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে, সে অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে এ কৌশলটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবার প্রয়োজন ছিল।

৮. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে-

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ মডিউল: সাধারণত লেকচার পদ্ধতিতেই এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি খুব কম প্রয়োগ করা হয়। সব ধরনের প্রশিক্ষণই মূলত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তবে প্রতিটি বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন এবং মন্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ থাকার ফলে অধিবেশনগুলো কিছুটা অংশগ্রহণমূলক হয়।[১৫২] প্রশিক্ষণ মডিউলগুলি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়না।[১৫৩]

ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ: প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ভূমি ব্যবস্থাপনা। তাঁরা ভূমি রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ, নামজারি, সরকারের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ভূমি হুকুমদখলসহ যাবতীয় কাজ করে থাকেন। উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ। এ পদে সাধারণত পদায়ন হয় চাকরি শুরুর বছর তিনেকের মধ্যে। এ পদে কাজ করার জন্য 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ' থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ দুইমাস মেয়াদি। এর মধ্যে ছয় সপ্তাহ যৌথ ক্যাম্পে থেকে কর্মকর্তারা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নেন। আর দুই সপ্তাহ সরেজমিনে প্রশিক্ষণ নিতে হয় মাঠে জরিপ কার্যক্রমের। সেখানে তাঁদের কাজ করতে হয় আমিন, কানুনগোদের সঙ্গে। মাঠে জরিপের চেইনও টানতে হয়। এই প্রশিক্ষণ ব্যতীত কর্মকর্তাদের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আস্থার সঙ্গে কাজ করা বেশ কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশিক্ষণটি উপেক্ষিত। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ অত্যন্ত জটিল। তাই পদায়নের আগেই তাঁদের একের পর এক প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত। এমনকি চাকরিতে স্থায়ীকরণের শর্ত হিসেবেও প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যদিও সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে পদায়নের আগে দুই সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে এটি 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ' এর প্রতিকল্প নয়।[৫৪]

নীতিমালা অনুসরণ না করা: প্রশিক্ষণ নীতিমালায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষানবিসকাল দুই বছরের মধ্যে কয়েকটি ক্যাডারের 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় না যেমন - পুলিশ, কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ, প্রশাসন (সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ)। নীতিমালায় বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর এক বছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয় না। প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা নেতিবাচক দিক হিসাবে পদোন্নতিতে প্রভাব ফেলবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে পদোন্নতির কোন সম্পর্ক নাই।

৯. জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

জনপ্রশাসনে শূন্যপদ ব্যতীত পদোন্নতি দেওয়ার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যা জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে। দীর্ঘদিন একই পদে থেকে কাজ করলে কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। এছাড়া পদোন্নতি প্রদানের শর্তগুলি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর মেধাবী, যোগ্য, দক্ষ, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগও রয়েছে। কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ক্ষমতাসীন দলের বন্দনা করে অর্জন করতে চায় পদোন্নতি।[৫৫]এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হলো-

প্রশাসনের উপরের স্তরে শূন্য পদের বিপরীতে অধিক পদোন্নতি ও এর প্রভাব

কর্মকর্তারা পদোন্নতি চাইবেন এটাই সত্য। তবে তা হতে হবে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলি মধ্য দিয়ে।[৫৬] উপ সচিব হতে অতিরিক্তি সচিব পদে শূন্য/ডিউটি পদের বেশি পদোন্নতি আর নিচের পদে কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমছে। কর্মকর্তাদের অভাবে অনেক ইউএনও পদশূন্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, জেলা প্রশাসকের দফতরের এডিসিহ সহকারী কমিশনারের বহুপদ শূন্য রয়েছে। আবার পদের অভাবে পদোন্নতি পেয়েও আগের পদেই আছেন কর্মকর্তারা।[৫৭]পদ সৃষ্টি না করেই পদোন্নতি বেশি দেওয়ায় পদায়ন নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। নিয়মবহির্ভূতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা পদোন্নতি দেওয়ার এই বিধান এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।[৫৮]

মুখ্য তথ্যদাতারা বলেছেন, এর বিরূপ প্রভাবে ভেঙে পড়েছে প্রশাসনের শৃঙ্খলা, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে চলছে নৈরাজ্য। এরূপ হয়ে আসছে প্রায় আড়াই দশক। মাত্রার হেরফের হতে পারে। তবে দুটো প্রধান দলের সরকারগুলোর সময়কালে এমনটাই ঘটে চলছে।একই পদে একাধিক কর্মকর্তা থাকায় কাজের ভাগাভাগি নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা খুলে কাজ ভাগাভাগি করে দেওয়া হচ্ছে। সচিবালয়ে অনুবিভাগের প্রধান থাকবেন অতিরিক্ত কিংবা যুগ্ম সচিব। এখন প্রায় সব অনুবিভাগই অতিরিক্ত সচিবদের নিয়ন্ত্রণে। তাতেও পদের সংকুলান হচ্ছে না। যুগ্ম সচিবরা অনেকেই উপসচিবের অধিশাখার দায়িত্ব পেয়েছেন অনুবিভাগ নামে। কোথাও বা সেই যুগ্ম সচিবরা অতিরিক্ত সচিবের মাধ্যমেই নথি পেশ করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁকে অনুবিভাগ প্রধানও বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবেরা সচিবালয় প্রশাসনের অনেকটা মেরুদন্ডের মতো। তাঁরা গুটিকয় ক্ষেত্র ব্যতীত সরাসরি মন্ত্রীর কাছে নথি উপস্থাপন করতে পারেন। সে মরুদন্ডের আকৃতি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। উপসচিবেরা তো বলতে গেলে শাখার দায়িত্ব পালন করছেন।অন্যদিকে নিচের পদে কর্মকর্তা কম থাকায় মাঠ প্রশাসনে কার্যসম্পাদনে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে সহকারী কমিশনার কম থাকায় অনেক উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তাকে ওই পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।[৫৯]

যুগ্মসচিবেরা উইং প্রধান হিসেবে সরাসরি সচিবের অধীনে থাকার কথা থাকলেও রুলস অব বিজনেসের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত সচিবের মাধ্যমে তাদের নথি সচিব পর্যায়ে পাঠাতে হয়। এতে অকারণে একটি স্তর সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে সরকারি কাজে সময় বেশি লাগছে। পদোন্নতি প্রাপ্তদের অনেকেই উচ্চতর দায়িত্ব পালনে সুযোগ পাচ্ছেন না ফলে জনপ্রশাসনের গতি ব্যাহত হচ্ছে।

পদোন্নতিতে দলীয়করণ

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে অনেক দিন থেকেই দলীয়করণের সংস্কৃতি চলে আসছে। পদোন্নতি বিষয়েই দলীয় লোকজন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার মধ্যেও দলীয় আনুগত্য বা বিশেষ দলের পক্ষপাতিত্ব তৈরি হয়। যোগ্যতাকে অতিক্রম করে পদোন্নতি পাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এর কোনোটাই প্রশাসনিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। এগুলো শুধু প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১৬০]বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য, দক্ষ ও সহযোগিতামূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। প্রশাসনের দক্ষতার ওপরই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। প্রশাসনের দলীয়করণের সুযোগ নিয়ে প্রশাসনেরও একটি অংশ সরকারকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। প্রশাসনে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিরা থাকলে তাঁরা সরকারকে নানা বিষয়ে সৎ ও উপযুক্ত পরামর্শ দেবে- এটা স্বতঃসিদ্ধ। এর ভিত্তিতে সরকার কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই তার গতি ঠিক রাখবে। অন্যদিকে অযোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শে সরকার কোনো পদক্ষেপ নিলে প্রতিপদে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। একটি সরকারকে শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ই নয়, আন্তরাষ্ট্রীয় অনেক বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেখানে অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ কখনোই নিরাপদ হতে পারে না।[১৬১]যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসে, তারা নিজেদের লোককে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদোন্নতি দেয় এবং তা করতে গিয়ে প্রায়ই জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা, এমনকি সততার প্রতি অবমূল্যায়ন করা হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রধান করায় সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলা। একেকটি পদোন্নতির ঘটনা তাই প্রশাসনের গতি আনার পরিবর্তে সৃষ্টি করছে জটিলতা। অযোগ্য ও অদক্ষ কর্মকর্তা নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না অপরদিকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিটি সঠিক সময়ে মূল্যায়ন না পেয়ে কাজে উৎসাহ হারান। ফলে প্রশাসনে সৃষ্টি হচ্ছে স্থবিরতা। উন্নয়নের প্রশ্নে এখনও আমরা আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। আগে প্রশাসনের কাজে গতি আনতে হবে এবং সে জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। সেক্ষেত্রে পদোন্নতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেতে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজেন বা রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারও এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা করেছে।[১৬২]

পদোন্নতির পরীক্ষা

সরকারি কর্মকর্তারা সরাসরি নিয়োগে প্রথম পদায়ন পান ৯ম গ্রেডে। নিয়োগের ছয় মাস পর হতে প্রথম দুই বছরের মধ্যে চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য সকল কর্মকর্তাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। সিনিয়র সহকারি সচিব ও সমমানের পদে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এর পরে আর কোনো ধাপে নিয়োগের জন্য কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কার্যক্রম নেই। এর ফলে পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় মেধা ও যোগ্যতা উপেক্ষিত হয়, যা পদোন্নতি নীতি বিরোধী। যখনই পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির প্রসঙ্গ আসে, তখন পূর্বের প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ টানেন বর্তমানে পদোন্নতিপ্রত্যাশী কর্মকর্তারা। তাঁরা বলতে চান, আগের কর্মকর্তারা তো কোনো পরীক্ষা ছাড়াই পদোন্নতি পেয়েছেন। এখনো তাই হওয়া সংগত বলে তাঁরা মনে করেন। এখন দ্বিতীয় গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতি অনেকটা অধিকারের মতো ধরে নিয়েছেন কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা[১৬৩]

১০. সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকার সরকারি সেবাকে কার্যকর করতে ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করতে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসারে যদিও ইতোমধ্যে আনেক পদেক্ষেপ নিয়েছেন,তবে মূখ্যতথ্যদাতাদের একাংশ অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের শুরু থেকেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফাইল পরিচালনার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় এখনও ডিজিটাল ফাইল ব্যবস্থাপনার আওতায় আসেনি। যদিও ২০১৪ সালের মধ্যে সব মন্ত্রণালয়কে এ পদ্ধতির আওতায় আনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্রও জারি করা হয়েছে। এখনও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাগজের ফাইলে নোট লেখা থেকে স্বাক্ষর হচ্ছে। নিচ থেকে ওপরে ফাইল আদানপ্রদানও হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে।[১৬৪]

জমির পর্চা উত্তোলনের আবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জেলা পর্যায়ের ভূমি রেকর্ড রুম থেকে সেবা নিতে ৮৯জন সেবাগ্রহীতার মধ্যে ৪৮.৩% সেবাগ্রহীতাকে ৪-৫ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়েছে; থাকা, খাওয়া ও যাতায়াত বাবদ গড়ে ৪৪৯টাকা ব্যয় করতে হয়েছে এবং ৩ বার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে যেতে হয়েছে। এছাড়াও, ৫৬% সেবাগ্রহীতাকে এ সেবার জন্য গড়ে ৭৩৭ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে। সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের অপূণাঙ্গ ডিজিটাইজেশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের সেবা সমন্বিতভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।[১৬৫]এখনও সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানের ও দক্ষতার অভাব রয়েছে।

১১. সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সরকারের সর্বশেষ পে-কমিশন বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে। ফলে সরকারি খাতের চাকরি এখন আকর্ষণীয় চাকরিতে পরিণত হয়েছে। এ খাতে বেতন-ভাতা বাড়ানোর কারণে বাজেটের একটি বড় অংশই এ খাতে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ৬৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবীদের

বেতন-ভাতায় যাবে ৬৬ হাজার ২২৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা খাতে যে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে, তা এক যুগ আগের বাজেটের সমান। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এম. সাইফুর রহমান ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ ওই অর্থবছরের বাজেটের সমান অর্থ খরচ করা হবে আগামী অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে। সরকারি খাতের বেতন-ভাতা বাবদ এইভাবে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আপত্তি জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন, সরকারি খাতে প্রসাশনিক ব্যয়ের বড় অংশই যাচ্ছে অপচয়ে। এতে বেড়ে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির হার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রশাসনে যে সংখ্যক পদ রয়েছে তার চেয়ে তিনগুণ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে বেতন-ভাতা বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে।

সারণি ১৩:জাতীয় বাজেট থেকে বেতন-ভাতায় বরাদ্দ (কোটি টাকা)

সাল	বরাদ্দ (কোটি টাকা)
২০১৪-২০১৫	২৮,৮৪০
২০১৫-২০১৬	৩৯৯৬১
২০১৬-২০১৭	৪৯৭৪৬
২০১৭-২০১৮	৫৬৪৩৯
২০১৮-২০১৯	৬৬২২৪

তথ্যসূত্র: *দৈনিক আমাদের সময়*, ৩ জুন ২০১৮।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ৪০ গুণ বেতন বাড়লেও গুণগতমান বা দক্ষতা বাড়েনি আমলাদের। পাশাপাশি সেবা প্রদানের মানসিকতাও কমেছে অনেক ক্ষেত্রে।দেশ স্বাধীনের পর এ পর্যন্ত আটটি বেতন স্কেল করেছে সরকার। এতে সচিবের বেতন বেড়েছে প্রায় ৪০ গুণ। ১০নং গ্রেডের কর্মকর্তাদের বেতন বেড়েছে ১৩০ গুণেরও বেশি। ১৯৭৩ সালে ১নং গ্রেড তথা সচিবের বেতন স্কেল ছিল দুই হাজার টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮ হাজার টাকায়। ১০নং গ্রেডে ১৯৭৩ সালে বেতন স্কেল ছিল ১৩০ টাকা। বর্তমানে সে বেতন স্কেল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার টাকায়। [১৬৬] বেতন বৃদ্ধি পেলেও দুর্নীতি হ্রাসের দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

অধ্যায় পাঁচ

উপসংহার ও সুপারিশ

শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত **১১**টি কৌশলের মধ্যে পাঁচটি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক, যেমন প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতন কাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন, সরকারি সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন। বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও তিনটি কৌশলের চর্চা এখনও শুরু হয় নি - 'বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি', জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন (স্বল্পমেয়াদী), এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' (দীর্ঘমেয়াদী) ।অন্যদিকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি) এবং প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।প্রশাসনের রাজনীতিকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি এবং ফলশ্রুতিতে পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের পদায়নের জন্য উপযুক্ত পদ না থাকার ফলে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা একদিকে পদায়নের জন্য তদবিরে লিপ্ত, অন্যদিকে এর ফলে মেধা ও দক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। এছাড়া প্রশাসনিক ধাপ ক্রমশ বাড়ায় প্রশাসনিক অদক্ষতা সৃষ্টি হচ্ছে।নিয়োগ প্রক্রিয়ায় (নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগের পূর্বে একাধিক আইন শৃঙ্খলা সংস্থা কর্তৃক তদন্ত) সময়ক্ষেপণের কারনে জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতি বছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে।

সরকার পরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হলো জনপ্রশাসন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পূর্বশর্ত- দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এদেশে জনপ্রশাসন যেমন জনগণের সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলোকে প্রয়োজনীয়প্রাধান্য দেয়নি, তেমনি সরকারগুলো কখনই দলীয়স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারেনি। প্রায়ই সরকারের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো জনপ্রশাসনের ওপর প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেছে অথবা সরকার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে জনপ্রশাসনকে ব্যবহার করেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রশাসনকে হতে হবে নিরপেক্ষ। সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনের আওতায় পরিচালিত হতে হবে জনপ্রশাসনকে। প্রশাসনকে দক্ষতা, যোগ্যতা ও সততার সঙ্গে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়াপ্রয়োজন। রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, আইনের বিধানই হবে সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের ভিত্তি। জনপ্রশাসনে নিয়োজিত গণকর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন, তাদেরকে রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ, তাদের কাজের স্বীকৃতিদান এবং জনসেবামুলক কার্যসম্পাদনে আগ্রহী করে তুলতে হবে, তবেই আমাদের জনপ্রশাসন হয়ে উঠবে দক্ষ ও সময়োপযোগী।

সুপারিশ

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯

১. 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'-কে শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে হালনাগাদ করতে হবে। আয়কর প্রদানের বাইরে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করতে হবে, এবং সে অনুযায়ী সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮

২. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বাতিল করতে হবে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ধারা, যেমন ৬(১) ও ৪৫ সংশোধন করতে হবে।

৩. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে 'সরকারি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে আইনের সংশোধন করতে হবে।

নিয়োগ

৪. জনপ্রশাসনের ওপরের পদগুলোতে শূন্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ না দিয়ে নিচের দিকের শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রশাসনের পিরামিড কাঠামো ঠিক থাকে।

পদোন্নতি

৫. পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব ক্যাডারের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সকল ক্যাডারের জন্য পদ ভেদে অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. প্রশাসন ক্যাডার হতে টেকনিক্যাল বিভাগের উচ্চপদে পদায়ন না করে টেকনিক্যাল ক্যাডার থেকে পদোন্নতি দিতে হবে।

৭. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোর এবং দক্ষতার মূল্যায়ন-পূর্বক পদোন্নতি নিশ্চিতের বিধান রাখতে হবে।

কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা

৮. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও কর্মবিভাগের উপযোগী করে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (Career Development Plan)' চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপগ্রহণ করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

৯. 'তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

---

[১]https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration (২৪এপ্রিল ২০১৯)

[২] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

[৩] এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, (ঢাকা: বাঁধন প্রকাশ, ১৯৮০)।

[৪]http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0 (২৮অক্টোবর ২০১৮)।

[৫]অনন্ত মাহফুজ, 'ঔপনিবেশিক জনপ্রশাসন এবং ক্যাডার সার্ভিস সংস্কার', *ঢাকা টাইমস্*, (ঢাকা, ২৯ মে ২০১৫)

[৬]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৩৩-৩৬।

[৭] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, *প্রাগুক্ত*।

[৮]Salhauddin Aminuzazaman & Sumaiya Khair, *National Integrity System Asesment Bangladesh*, TIB, 14 May, 2014.

[৯] এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, (ঢাকা: বাঁধন প্রকাশ, ১৯৮০)।

[১০]Ministry of Public Administration, Statistics of Officers and Staffs, 2016.

[১১]টিআইবি, *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি*, (ঢাকা: টিআইবি ২০১৪)।

[১২]জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, *প্রাগুক্ত*।

[১৩]প্রাগুক্ত

[১৪]Integrity Institute of Malaysia, *National Integrity plan*, (Kuala Lalampur, 23 April 2004).

[১৫]*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫২।

[১৬]জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, *প্রাগুক্ত*।

[১৭]ধীরাজ কুমার নাথ, 'পাবলিক সার্ভিসে উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজন সুশাসন প্রতিষ্ঠা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা, ৩০ জুন ২০১৬)।

[১৮]Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences. Politicization of the civil service in comparative perspective: The quest for control, London: Routledge. pp. 1-13.

[১৯]আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭)।

[২০] আব্দুল লতিফ মন্ডল, *সরকারি কর্মচারীরা যেন আচরণবিধি ভুলে না যান, যুগান্তর, (ঢাকা, ১২ অক্টোবর ২০১৬)*

[২১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*, ২০১৫।

[২২]ড. হারুন রশীদ, 'জনপ্রশাসনে পদোন্নতি ও সুশাসন', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি ২০১৮।

[২৩]হাসনাত আব্দুল হাই, 'বাংলাদেশে সরকার ও জনপ্রশাসন',ঢাকা, ২০১১;http://bdnewstest.blogspot.com/2011/01/by_7214.html(২৮অক্টোবর ২০১৮)|

[২৪]মাহফুজ, *প্রাগুক্ত*।

[২৫]এমাজউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত।*

[২৬]তপন বিশ্বাস, 'বদলায় না আমলাতন্ত্র।। সংস্কারের সব উদ্যোগই থমকে যায়', দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

[২৭]হাসনাত আব্দুল হাই, *প্রাগুক্ত*।

[২৮]*প্রাগুক্ত*।

[২৯]সিভিল সার্ভিস, বাংলাপিডিয়া, ttp://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B2

_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B8 (২৯অক্টোবর ২০১৮)।

[৩০]হাসনাত আব্দুল হাই, *প্রাগুক্ত*।

[৩১]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনসিভিল সার্ভিস, বাংলাপিডিয়া, *প্রাগুক্ত*।

[৩২]হাসনাত আব্দুল হাই, *প্রাগুক্ত*।

[৩৩]সিদ্দিকুর রহমান, 'আমলাতন্ত্র সংস্কার প্রস্তব আলোতে আসছে না', *সাম্প্রতিক দিনকাল*, (ঢাকা: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)।

[৩৪]তপন বিশ্বাস, 'আজকের জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা-প্রশ্ন যখন দক্ষতার' ,*দৈনিক জনকন্ঠ*, (ঢাকা: ২৬ আগষ্ট ২০১৪)।

[৩৫]'বেতন কমিশনের প্রতিবেদনে যা আছে', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, (ঢাকা: ২২ ডিসেম্বর ২০১৪)।

[৩৬]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনwww.mopa.gov.bd/ (২০ জুলাই ২০১৮)।

[৩৭]জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, *প্রাগুক্ত*।

[৩৮]শাম্মি লায়লাইসলাম ও সাধন কুমার দাস,*জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি*, টিআইবি ২০১৪।

[৩৯]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন নং- ০৪.৬১১.০৭৪.০২.২০১২-১৬০, ডিসেম্বর ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪০]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্মারক নম্বর- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-৩৩৮, ২১জানুয়ারি ২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪১]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮*।

[৪২]সাক্ষাৎকার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, ২১ আগস্ট ২০১৮।

[৪৩]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১*, ধারা২(৪)।

[৪৪]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-মপবি/গসসে/সুশাসন প্রোগ্রাম/৫২/২০০৭/৩৯৬; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪৫]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-মপবি/গসসে/সুশাসন প্রোগ্রাম/৫২/২০০৭/৩৯৬; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪৬]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-মপবি/গসসে/সুশাসন (অভিযোগ- ফোকাল পয়েন্ট/৫৪/২০০৭/৫২২; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪৭]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-মপবি/গসসে/সুশাসন (অভিযোগ- ফোকাল পয়েন্ট/৫৪/২০০৭/৮২৮; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৪৮]GoB & UNDP, *Situation Analysis Report,Grievance Redress System in Bangladesh*, Dhaka, April 2016.

[৪৯] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-০৪.২২২.০১৪.০১.০৬.০২৬.২০১০-৩২৬; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫০]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫১]সাক্ষাৎকার, যুগ্ম সচিব-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ১৬ অক্টোবর ২০১৮।

[৫২]সাক্ষাৎকার, যুগ্ম সচিব-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ১৬ অক্টোবর, ২০১৮।

[৫৩]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,
বাংলাপিডিয়া,http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8 (২৭ অক্টোবর,২০১৮)

[৫৪] সাক্ষাৎকার, যুগ্ম সচিব-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ১৬ অক্টোবর, ২০১৮।

[৫৫] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, *জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫৬]মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৫৭]ফখরুল ইসলাম, 'গাড়ি কিনতে সুদ ছাড়াই ৩০ লাখ টাকা ঋণ', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ২০১৭।

[৫৮]অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক।

[৫৯] অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক।

[৬০]অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক।

[৬১]অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক।

[৬২]সৈয়দ সামসুজ্জামান নীপু, 'সরকারি চাকুরেদের গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম ১ অক্টোবর থেকে', *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৬৩]সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়ানো হয়েছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ২৩ মে ২০১৯

[৬৪]বাংলাপিডিয়া, 'বাংলাদেশ সরকারি চাকুরি নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১', http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%97_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,_%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AE%E0%A7%A7_(১ নভেম্বর ২০১৮)।

[৬৫]*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৯(১)।

[৬৬]*প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ২৮(১)।

[৬৭]*প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ২৮(৪)।

[৬৮]*প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ২৯(১)।

[৬৯]আলীরীয়াজ, 'চাকরিতে কোটা-বাতিল নয়, সংস্কারেই সমাধান' ,*প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ২০১৮।

[৭০]শ্যামল সরকার, 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ চলছেই', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৬ জুলাই ২০১১।

[৭১]মাহমুদুল আলম, 'চুক্তিচ্যাপ্টা প্রশাসন', *বাংলা ইনসাইডার*, ঢাকা, ৩১ মে ২০১৭।

[৭২]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮*, ধারা ৪৯(১)।

[৭৩]Ministry of Public Administration, *Statistics of Civil Officers and Staffs, 2017*, People's Republic of Bangladesh.

[৭৪]*সমকাল*, 'যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ১৫৪ কর্মকর্তা', ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮; সাক্ষাতকার, জনপ্রশাসন কর্মকর্তা; একুশে টেলিভিশন, *উপ সচিব হলেন যারা*, ২৫ অক্টোবর ২০১৮; জাগোনিউজ২৪.কম, *অতিরিক্ত সচিব পদে ১৫৪ কর্মকর্তার পদোন্নতি*, ৩০ আগস্ট ২০১৮; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট-http://old.mopa.gov.bd/en/home/officer/110

[৭৫]Ministry of Public Administration, *প্রাগুক্ত*।

[৭৬]Naznin Tithi,'An unrealistic quota system', *The Daily Star*, Dhaka,5March 2018.

[৭৭]মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, 'কোটা সংস্কার-যৌক্তিকভাবে কাজটি করতে হবে', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

[৭৮]*কালের কণ্ঠ*, 'মেধা কোটা ৪৫%, বাস্তবে নিয়োগ ৭০-কারণ সংরক্ষিত কোটায় হাহাকার', ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ২০১৮।

[৭৯]আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭)

[৮০]ইলিরা দেওয়ান, 'কোটা সংস্কার-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ', *প্রথম আলো*, ঢাকা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৮১]উবায়দুল্লাহ বাদল, 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে পিছিয়ে পড়ছে মেধাবীরা-ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে প্রশাসনের', *যুগান্তর*, ঢাকা ৫ নভেম্বর, ২০১৭

[৮২]*প্রাগুক্ত*।

[৮৩]আশরাফ আলী, 'প্রশাসনের আস্থাভাজনদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বেড়েই চলেছে- ভেঙে পড়ছে চেইন অব কমান্ড নষ্ট হচ্ছে ভারসাম্য' ,*নয়াদিগন্ত*, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

[৮৪]উবায়দুল্লাহ বাদল, 'প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছে নারী', *যুগান্তর*, ঢাকা, ৮ মার্চ ২০১৮।

[৮৫]ফখরুল ইসলাম, 'জনপ্রশাসনের উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা বাড়ছে', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১৭।

[৮৬] *দৈনিক সমকাল*, 'সরকারি কলেজে ওএসডি-পদায়নে ভারসাম্যহীনতা দূর করুন', ঢাকা, ১০ আগস্ট ২০১৫।

[৮৭] *কালের কণ্ঠ*, 'বিদেশে পদায়নের হিড়িক মন্ত্রী ও ক্ষমতাঘনিষ্ঠদের', ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

[৮৮] *যুগান্তর*, 'তদবির না করতে পরিপত্র জারি', ঢাকা, ২২ জুলাই ২০১৫।

[৮৯] *মানবজমিন*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ২৭ জানুয়ারি ২০১৯।

[৯০] বাহরাম খান, 'আমলাতন্ত্রের চক্করে সরকারি কর্মচারী আইন', *আজকালের খবর*, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৮।

[৯১] *সমকাল*, 'মন্ত্রিসভায় আইনের খসড়া-অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার নয়', ২১ আগস্ট ২০১৮।

[৯২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সরকারি চাকরি আইন*, ২০১৮, ধারা ৬(১)।

[৯৩] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৭(১)।

[৯৪] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৮(১)।

[৯৫] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৪২(১)।

[৯৬] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৪১(১)।

[৯৭] *প্রাগুক্ত*, ধারা ৪২(৩)

[৯৮] *প্রাগুক্ত*, ধারা ১৮।

[৯৯] http://www.bpatc.org.bd/index.php?pageid=44 (১২ অক্টোবর ২০১৮)

[১০০] Bangladesh Public Administration Training Centre, *Training Calender 2017-18.*

[১০১] http://www.bcsadminacademy.gov.bd/site/page/aa60d4c7-8cfc-43a2-b8f2-c8ed64d24244/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF (১২ অক্টোবর ২০১৮)

[১০২] বাংলাপিডিয়া, http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8(১২ অক্টোবর ২০১৮)

[১০৩] ড. হারুন রশীদ, 'জনপ্রশাসনে পদোন্নতি ও সুশাসন', *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ৫ জানুয়ারী ২০১৮।

[১০৪] শ্যামল সরকার, 'প্রশাসনে ওএসডি ন্যস্ত আর সংযুক্তির ছড়াছড়ি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ২০১৫।

[১০৫] মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, 'শূন্যপদ ছাড়া পদোন্নতি আর্থিক ক্ষতিসাধন ও প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে', *বণিকবার্তা*, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৮, ২০১৬।

[১০৬] শ্যামল সরকার, *প্রাগুক্ত*।

[১০৭] রোজিনা ইসলাম, 'মহাজোট সরকারের দুই বছর গতি পায়নি জনপ্রশাসন', *প্রথম আলো*, ঢাকা,৩ জানুয়ারি ২০১১।

[১০৮] আলী ইমাম মজুমদার, 'জনপ্রশাসনে পদোন্নতি: গোদের উপর বিষফোড়া', *প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ ২০১৩।

[১০৯] শফিকুল ইসলাম, 'সচিবালয়ে ওএসডি কর্মকর্তাদের সময় কাটে যেভাবে', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২৩ডিসেম্বর ২০১৭।

[১১০] মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, *প্রাগুক্ত*।

[১১১] সাক্ষাৎকার, সাবেক কেবিনেট সচিব, ২০ আগষ্ট, ২০১৯

[১১২] শ্যামল সরকার, *প্রাগুক্ত*।

[১১৩]মহিউদ্দিন মাহী, 'সচিবালয়ে পদোন্নতি বঞ্চনায় ক্ষোভ', *ঢাকা টাইমস*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

[১১৪]আলী ইমাম মজুমদার, 'জনপ্রশাসন-অধরাই রয়ে যাচ্ছে সুশাসন,'*প্রথম আলো*, ১৭ জুন ২০১২।

[১১৫]*কালের কণ্ঠ*, 'মধ্যম আয়ের দেশের পথেই ওঠেনি প্রশাসন', ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

[১১৬]*শীর্ষ নিউজ ডট কম*, 'শাসনে পদোন্নতি ও ডিসি পদায়নে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' আতংক', ২৮ নভেম্বর ২০১৭।

[১১৭]মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, *প্রাগুক্ত*।

[১১৮]আসাদুজ্জামান আজম, 'এটুআই প্রকল্প রূপ নিচ্ছে ফাউন্ডেশনে', *অর্থসূচক*, ৯ অক্টোবর ২০১৭।

[১১৯]আব্দুল্লাহ্ আল নূহু, 'প্রকল্প এটুআই: ছোট যাত্রা, বড় অর্জন',*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ২০১৪।

[১২০]*প্রাগুক্ত*।

[১২১]*প্রাগুক্ত*।

[১২২]*প্রাগুক্ত*।

[১২৩]*ঢাকা টাইমস*, 'সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ছে ১৪৭ ভাগ', ৭ ডিসেম্বর ২০১৪।

[১২৪]মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, 'অষ্টম পে-স্কেল: একটি পর্যালোচনা', *বনিক বার্তা*, ২১সেপ্টেম্বর ২০১৫।

[১২৫]*অর্থসূচক*, 'নতুন পে-স্কেলের ইনক্রিমেন্ট চালু হবে ২০১৮ সালে', ১২ মার্চ ২০১৭।

[১২৬]*দৈনিক ইনকিলাব*, '২০১৮ সালে নতুন পে-স্কেলের ইনক্রিমেন্ট', ১৩ মার্চ ২০১৭।

[১২৭]*সাম্প্রতিক দেশকাল*, 'সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি সংশোধন চূড়ান্ত', ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ২০১৬।

[১২৮]*ঢাকা টাইমস*, *প্রাগুক্ত*।

[১২৯]সাক্ষাৎকার, উপ পরিচালক, ১২ জুলাই ২০১৮।

[১৩০]*প্রাগুক্ত*।

[১৩১]বদিউল আলম মজুমদার, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে 'হুইসেলব্লোয়ার' আইন', *প্রথম আলো*, ২৪ আগষ্ট ২০১২।

[১৩২]সুত্র-প্রশাসন-২ অধিশাখার ইউ.ও.নোট নং-০৫.০০.০০০১.১১.০৯.০২১.১৭-৩৯ তারিখ:১১/০১/২০১৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

[১৩৩]*যুগান্তর*, 'জনপ্রশাসনে বঞ্চনার নতুন নজির-৪ বছর পর জানলেন তিনি নির্দোষ!', ১৭ সেপ্টেম্বর২০১৭।

[১৩৪]শহীদুল ইসলাম, 'সচিবদের ভুয়া সনদ: চিঠির 'অপেক্ষায়' জনপ্রশাসন', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[১৩৫]উবায়দুল্লাহ বাদল, 'আবারও প্রশাসনে তিন স্তরের পদোন্নতি-অতিরিক্ত সচিব হচ্ছেন দেড়শ' কর্মকর্তা',*যুগান্তর*, ২ আগস্ট ২০১৮।

[১৩৬]Wasim Bin Habib and Tuhin Shubhra Adhikary, *Civil Bureaucracy: Quotas pushing it downhill*, 15February, 2018.

[১৩৭]Public Administration Reform Commission (PARC). 2000. Public Administration for 21st Century: Report of the PARC, Vol.1. Dhaka: PARC.

[১৩৮]*প্রথম আলো*, সাক্ষাৎকার: আকবর আলি খান, কোটা সংস্কারের দাবি যৌক্তিক, ১১ এপ্রিল ২০১৮।

[১৩৯]অনুপম দেবাশিষরায়, 'কোটাব্যবস্থা যেমন হওয়া উচিত', *প্রথম আলো*, ১২ এপ্রিল ২০১৮।

[১৪০]*প্রথম আলো*, 'আমাদের সামনে অনেক ঝুঁকি: আকবর আলি খান', ১ জানুয়ারী ২০১৮।

[১৪১]*প্রাগুক্ত*।

[১৪২]*কালের কণ্ঠ*, 'মধ্যম আয়ের দেশের পথেই ওঠেনি প্রশাসন',৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

[১৪৩]আলী ইমাম মজুমদার, *প্রাগুক্ত*।

[১৪৪]*যুগান্তর*, 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনে উদ্যোগ নেই', ৩০ জুন ২০১৮।

[১৪৫]*দৈনিক শিক্ষা ডেস্ক*, 'আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে', ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

[১৪৬]আলী ইমাম মজুমদার, 'নিয়োগে কেন এত কালক্ষেপণ?' ,*প্রথম আলো*, ১৮ জুলাই ২০১৮।

[১৪৭]সাক্ষাৎকার, উপ-পরিচালক, ১২জুলাই২০১৮।

[১৪৮]আরিফুর রহমান, 'উন্নয়ন বাজেটে নারী উপেক্ষিত', *কালের কণ্ঠ*, ২৯ মে ২০১৮।

[১৪৯]গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন*, ১৯৬৭, ধারা ৫(২)।

[১৫০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,*দুর্নীতি দমন কমিশন আইন*, *২০০৪*, ধারা ৫।

[১৫১]মোর্শেদ নোমান, 'নিজেদের জন্য দুদকের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা কমাতে চান আমলারা', *প্রথম আলো*,২৮ মে ২০১৮।

[১৫২]বাংলাপিডিয়া
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)।

[১৫৩]সাক্ষাৎকার, সাবেক কেবিনেট সচিব, ২০ আগষ্ট, ২০১৯

[১৫৪]আলী ইমাম মজুমদার, 'লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে পদায়ন কাঙ্খিত নয়', *প্রথম আলো*, ১১ মে ২০১৬।

[১৫৫]ড. হারুন রশীদ, 'জনপ্রশাসনে পদোন্নতি ও সুশাসন', *কালের কণ্ঠ*, ৫ জানুয়ারী ২০১৮।

[১৫৬]মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, *প্রাগুক্ত*।

[১৫৭]সিদ্দিকুর রহমান, 'প্রশাসন নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জে সরকার', *মানবকণ্ঠ*, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭।

[১৫৮]*দৈনিক সংগ্রাম*, 'সিনিয়র সচিব' বানানোর হিড়িক -অতিরিক্ত পদোন্নতিতে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা-রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে চলছে নৈরাজ্য', ১০ আগস্ট ২০১৪।

[১৫৯]শরিফুজ্জামান, 'মাথাভারী প্রশাসনে এবার বঞ্চিতদের পদোন্নতি', *প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[১৬০]*কালের কণ্ঠ*, 'প্রশাসনে পদোন্নতি- যোগ্যতা হোক মাপকাঠি', ৮ এপ্রিল ২০১৫।

[১৬১]*প্রাগুক্ত*।

[১৬২]তপন বিশ্বাস, 'বদলায় না আমলাতন্ত্র-সংস্কারের সব উদ্যোগই থমকে যায়', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩১ জানুয়ারি ২০১৬।

[১৬৩]আলী ইমাম মজুমদার, 'প্রশাসনে পদোন্নতিঃ রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এমনটা করা হয়েছিল', *প্রথম আলো*, ১৮ মে ২০১৬।

[১৬৪]শরীফুল ইসলাম, 'প্রশাসন সংস্কার শুধু খসড়ায়', *সমকাল*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

[১৬৫]টিআইবি, 'নাগরিক সেবায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার: ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ', ২০১৭।

[১৬৬]তপন বিশ্বাস, 'বাড়েনি দক্ষতা ও সেবা', *দৈনিক জনকণ্ঠ*,১০ অক্টোবর ২০১৬।